মালঞ্চ

মালঞ্চ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

মালঞ্চ

প্রথম সংস্করণ (২১০০) চৈত্র, ১৩৪০ সাল।

মূল্য—১৷৹

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মালঞ্চ

১

পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু করা। নীরজা আধ-শোওয়া প'ড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হাল্‌কা মেঘের তলায়। ফ্যাকাসে তার শাঁখের মতো রং, ঢিলে হয়ে পড়েছে চুড়ি, রোগা হাতে নীল শিরার রেখা, ঘনপক্ষ্ম চোখের পল্লবে লেগেছে রোগের কালিমা।

মেঝে সাদা মার্ব্বেলে বাঁধানো, দেয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি, ঘরে পালঙ্ক, একটি টিপাই, দুটি বেতের মোড়া আর এক কোণে কাপড় ঝোলাবার আল্‌না ছাড়া অন্য কোনো আস্‌বাব নেই; এক কোণে

পিতলের কলসীতে রজনী-গন্ধার গুচ্ছ, তারি মৃদু গন্ধ বাঁধা পড়েছে ঘরের বদ্ধ হাওয়ায়।

পূবদিকে জানলা খোলা। দেখা যায় নীচের বাগানে অর্‌কিডের ঘর, ছিটে বেড়ায় তৈরী ; বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা। অদূরে ঝিলের ধারে পাম্প্‌ চল্‌ছে, জল কুলকুল করে বয়ে যায় নালায় নালায়, ফুলগাছের কেয়ারির ধারে ধারে। গন্ধনিবিড় আমবাগানে কোকিল ডাক্‌ছে যেন মরিয়া হয়ে।

বাগানের দেউড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজ্‌ল বেলা ছুপুরের। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের সঙ্গে তার সুরের মিল। তিনটে পর্য্যন্ত মালীদের ছুটি। ঐ ঘণ্টার শব্দে নীরজার বুকের ভিতরটা ব্যথিয়ে উঠ্‌ল, উদাস হয়ে গেল তার মন। আয়া এল দরজা বন্ধ করতে। নীরু বল্‌লে, না না থাক্। চেয়ে রইল যেখানে ছড়াছড়ি যাচ্চে রৌদ্র-ছায়া গাছগুলোর তলায় তলায়।

ফুলের ব্যবসায়ে নাম করেছে তার স্বামী আদিত্য। বিবাহের পরদিন থেকে নীরজার ভালোবাসা আর তার স্বামীর ভালোবাসা নানা ধারায় এসে মিলেছে এই বাগানের নানা সেবায় নানা কাজে। এখানকার ফুলে পল্লবে ছুজনের সম্মিলিত আনন্দ নব নব রূপ নিয়েছে

নব নব সৌন্দর্য্যে। বিশেষ বিশেষ ডাক আসবার দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রবাসী যেমন অপেক্ষা করে চিঠির, ঋতুতে ঋতুতে তেমনি ওরা অপেক্ষা করেছে ভিন্ন ভিন্ন গাছের পুঞ্জিত অভ্যর্থনার জন্যে।

আজ কেবল নীরজার মনে পড়্‌ছে সেই দিনকার ছবি। বেশি দিনের কথা নয়, তবু মনে হয় যেন একটা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যুগান্তরের ইতিহাস। বাগানের পশ্চিমধারে প্রাচীন মহানিম গাছ। তারি জুড়ি আরো একটা নিম গাছ ছিল; সেটা কবে জীর্ণ হয়ে পড়ে গেছে; তারি গুঁড়িটাকে সমান করে কেটে নিয়ে বানিয়েছে একটা ছোটো টেবিল। সেইখানেই ভোর বেলায় চা খেয়ে নিত দু'জনে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ডালে-ছাঁকা রৌদ্র এসে পড়্‌ত পায়ের কাছে; শালিখ কাঠবিড়ালি হাজির হোতো প্রসাদপ্রার্থী। তার পরে দোঁহে মিলে চল্‌ত বাগানের নানা কাজ। নীরজার মাথার উপরে একটা ফুলকাটা রেশমের ছাতি, আর আদিত্যর মাথায় সোলার টুপি, কোমরে ডাল-ছাঁটা কাঁচি। বন্ধুবান্ধবরা দেখা করতে এলে বাগানের কাজের সঙ্গে মিলিত হোতো লৌকিকতা। বন্ধুদের মুখে প্রায় শোনা যেত,—"সত্যি বল্‌ছি, ভাই, তোমার

ডালিয়া দেখে হিংসে হয়।” কেউবা আনাড়ির মতো জিজ্ঞাসা করেছে, “ওগুলো কি সূর্য্যমুখী ?”—নীরজা ভারি খুসী হয়ে হেসে উত্তর করেছে, “না, না, ওতো গাঁদা !” একজন বিষয়বুদ্ধি-প্রবীণ একদা বলেছিল—“এত বড়ো মোতিয়া বেল কেমন করে জন্মালেন, নীরজা দেবী ? আপনার হাতে জাদু আছে। এ যেন টগর।” সমজ্‌দারের পুরস্কার মিল্‌ল ; হলা মালীর ভ্রূকুটি উৎপাদন ক'রে পাঁচটা টবসুদ্ধ সে নিয়ে গেছে বেলফুলের গাছ। কতদিন মুগ্ধ বন্ধুদের নিয়ে চল্‌ত কুঞ্জপরিক্রম, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সব্‌জির বাগানে। বিদায়-কালে নীরজা ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগ্‌নোলিয়া, কার্‌নেশন্‌,—তার সঙ্গে পেঁপে, কাগজি লেবু, কয়েৎ-বেল,—ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েৎবেল। যথাঋতুতে সব শেষে আস্‌ত ডাবের জল। তৃষিতেরা বল্‌ত, “কী মিষ্টি জল !” উত্তরে শুন্‌ত, “আমার বাগানের গাছের ডাব।” সবাই বল্‌ত, “ওঃ, তাইতো বলি !”

সেই ভোরবেলাকার গাছতলায় দার্জ্জিলিং চায়ের বাষ্পে মেশা নানা ঋতুর গন্ধস্মৃতি দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে মিলে হায় হায় করে ওর মনে। সেই সোনার রঙে

রঙীন দিনগুলোকে ছিঁড়ে ফিরিয়ে আনতে চায় কোন্ দস্যুর কাছ থেকে। বিদ্রোহী মন কাউকে সামনে পায় না কেন? ভালোমানুষের মতো মাথা হেঁট ক'রে ভাগ্যকে মেনে নেবার মেয়ে নয় ও তো। এর জন্যে কে দায়ী? কোন্ বিশ্বব্যাপী ছেলেমানুষ! কোন্ বিরাট পাগল! এমন সম্পূর্ণ সৃষ্টিটাকে এতবড়ো নিরর্থকভাবে উলটপালট করে দিতে পার্‌লে কে!

বিবাহের পর দশটা বছর একটানা চলে গেল অবিমিশ্র সুখে। মনে মনে ঈর্ষ্যা করেছে সখীরা; মনে করেছে ওর যা বাজারদর তার চেয়ে ও অনেক বেশি পেয়েছে। পুরুষ বন্ধুরা আদিত্যকে বলেছে, "লাকি ডগ্।"

নীরজার সংসার-সুখের পালের নৌকো প্রথম যে ব্যাপার নিয়ে ধস্ ক'রে একদিন তলায় ঠেক্‌ল সে ওদের "ডলি" কুকুর-ঘটিত। গৃহিণী এ সংসারে আসবার পূর্ব্বেই ডলিই ছিল স্বামীর একলা ঘরের সঙ্গিনী। অবশেষে তার নিষ্ঠা বিভক্ত হোলো দম্পতির মধ্যে। ভাগে বেশি পড়েছিল নীরজার দিকেই। দরজার কাছে গাড়ি আসতে দেখলেই কুকুরটার মন যেত বিগ্‌ড়িয়ে। ঘন ঘন ল্যাজ আন্দোলনে আসন্ন রথযাত্রার বিরুদ্ধে

আপত্তি উত্থাপন কর্‌ত। অনিমন্ত্রণে গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে ওঠবার দুঃসাহস নিরস্ত হোতো স্বামীর তর্জ্জনী সঙ্কেতে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ল্যাজের কুণ্ডলীর মধ্যে নৈরাশ্যকে বেষ্টিত করে দ্বারের কাছে পড়ে থাকত। ওদের ফেরবার দেরি হোলে মুখ তুলে বাতাস ঘ্রাণ করে করে ঘুরে বেড়াত, কুকুরের অব্যক্ত ভাষায় আকাশে উচ্ছ্বসিত কর্‌ত করুণ প্রশ্ন। অবশেষে এই কুকুরকে হঠাৎ কী রোগে ধর্‌লে, শেষ পর্য্যন্ত ওদের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি স্তব্ধ রেখে নীরজার কোলে মাথা দিয়ে মারা গেল।

নীরজার ভালোবাসার ছিল প্রচণ্ড জেদ। সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিধাতারও হস্তক্ষেপ তার কল্পনার অতীত। এতদিন অনুকূল সংসারকে সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছে। আজ পর্য্যন্ত বিশ্বাস নড়বার কারণ ঘটেনি। কিন্তু আজ ডলির পক্ষেও যখন মরা অভাবনীয়রূপে সম্ভবপর হোলো তখন ওর দুর্গের প্রাচীরে প্রথম ছিদ্র দেখা দিল। মনে হোলো এটা অলক্ষণের প্রথম প্রবেশ দ্বার। মনে হোলো বিশ্ব-সংসারের কর্ম্মকর্ত্তা অব্যবস্থিতচিত্ত,—তাঁর আপাত-প্রত্যক্ষ প্রসাদের উপরেও আর আস্থা রাখা চলে না।

নীরজার সন্তান হবার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের আশ্রিত গণেশের ছেলেটাকে নিয়ে যখন নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে, আর ছেলেটা যখন তার অশান্ত অভিঘাত আর সইতে পারছে না এমন সময় ঘট্‌ল সন্তান-সম্ভাবনা। ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠ্‌ল ভ'রে, ভাবীকালের দিগন্ত উঠ্‌ল নবজীবনের প্রভাত-আভায় রক্তিম হয়ে, গাছের তলায় বসে বসে আগন্তুকের জন্যে নানা অলঙ্করণে নীরজা লাগ্‌ল সেলাইয়ের কাজে।

অবশেষে এল প্রসবের সময়। ধাত্রী বুঝতে পার্‌লে আসন্ন সঙ্কট। আদিত্য এত বেশি অস্থির হয়ে পড়্‌ল যে ডাক্তার ভর্ৎসনা করে তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখ্‌লে। অস্ত্রাঘাত করতে হোলো, শিশুকে মেরে জননীকে বাঁচালে। তারপর থেকে নীরজা আর উঠ্‌তে পার্‌লে না। বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বল্পরক্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে। প্রাণশক্তির অজস্রতা একেবারেই হোলো নিঃস্ব। বিছানার সামনে জানলা খোলা, তপ্ত হাওয়ায় আস্‌ছে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ, কখনো বাতাবীফুলের নিঃশ্বাস,

যেন তার সেই পূর্ব্বকালের দূরবর্ত্তী বসন্তের দিন মৃদুকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করছে, "কেমন আছ?"

সকলের চেয়ে তাকে বাজ্‌ল যখন দেখ্‌লে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্যে আদিত্যের দূর সম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে। খোলা জানলা থেকে যখনি সে দেখে অভ্র ও রেশমের কাজ-করা একটা টোকা মাথায় সরলা বাগানের মালীদের খাটিয়ে বেড়াচ্চে তখন নিজের অকর্ম্মণ্য হাত-পা-গুলোকে সহ্য করতে পার্‌ত না। অথচ সুস্থ অবস্থায় এই সরলাকেই প্রত্যেক ঋতুতে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে নতুন চারারোপণের উৎসবে। ভোরবেলা থেকে কাজ চল্‌ত। তারপরে ঝিলে সাঁতার কেটে স্নান, তারপরে গাছের তলায় কলাপাতায় খাওয়া, একটা গ্র্যামোফোনে বাজ্‌ত দিশি বিদিশি সঙ্গীত। মালীদের জুট্‌ত দই চিঁড়ে সন্দেশ। তেঁতুলতলা থেকে তাদের কলরব শোনা যেত। ক্রমে বেলা আস্‌ত নেমে, ঝিলের জল উঠ্‌ত অপরাহ্ণের বাতাসে শিউরিয়ে, পাখী ডাক্‌ত বকুলের ডালে, আনন্দময় ক্লান্তিতে হোতো দিনের অবসান।

ওর মনের মধ্যে যে-রস ছিল নিছক মিষ্ট, আজ

কেন সে হয়ে গেল কটু; যেমন আজকালকার দুর্ব্বল শরীরটা ওর অপরিচিত, তেমনি এখনকার তীব্র নীরস স্বভাবটাও ওর চেনা স্বভাব নয়। সে-স্বভাবে কোনো দাক্ষিণ্য নেই। এক একবার এই দারিদ্র্য ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লজ্জা জাগে মনে, তবু কোনোমতে সামলাতে পারে না। ভয় হয়, আদিত্যের কাছে এই হীনতা ধরা পড়্‌ছে বুঝি, কোন্‌দিন হয় তো সে প্রত্যক্ষ দেখ্‌বে নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্র-প্রয়োজনের অযোগ্য।

বাজ্‌ল দুপুরের ঘণ্টা। মালীরা গেল চলে। সমস্ত বাগানটা নির্জ্জন। নীরজা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে দুরাশার মরীচিকাও আভাস দেয় না, যেখানে ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি।

২

নীরজা ডাকৃল, "রোশ্‌নি"।

আয়া এল ঘরে। প্রৌঢ়া, কাঁচা পাকা চুল, শক্ত হাতে মোটা পিতলের কঙ্কণ, ঘাঘ্‌রার উপরে ওড়্‌না। মাংসবিরল দেহের ভঙ্গীতে ও শুষ্ক মুখের ভাবে একটা চিরস্থায়ী কঠিনতা। যেন ওর আদালতে এদের সংসারের প্রতিকূলে ও রায় দিতে বসেছে। মানুষ করেছে নীরজাকে, সমস্ত দরদ তার পরেই। তার কাছাকাছি যারা যায় আসে, এমন কি, নীরজার স্বামী পর্য্যন্ত, তাদের সকলেরই সম্বন্ধে ওর একটা সতর্ক বিরুদ্ধতা।

ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "জল এনে দেব খোঁখী।"

"না, বোস্।" মেঝের উপর হাঁটু উঁচু করে বস্‌ল আয়া।

নীরজার দরকার কথা কওয়া, তাই আয়াকে চাই। আয়া ওর স্বগত উক্তির বাহন।

নীরজা বল্‌লে, "আজ ভোরবেলায় দরজা খোলার শব্দ শুনলুম।"

আয়া কিছু বল্‌লে না, কিন্তু তার বিরক্ত মুখভাবের অর্থ এই যে, "কবে না শোনা যায়!"

নীরজা অনাবশ্যক প্রশ্ন করল, "সরলাকে নিয়ে বুঝি বাগানে গিয়েছিলেন।"

কথাটা নিশ্চিত জানা, তবু রোজই একই প্রশ্ন। একবার হাত উল্‌টিয়ে মুখ বাঁকিয়ে আয়া চুপ করে বসে রইল।

নীরজা বাইরের দিকে চেয়ে আপন মনে বল্‌তে লাগল, "আমাকেও ভোরে জাগাতেন, আমিও যেতুম বাগানের কাজে, ঠিক ঐ সময়েই। সে তো বেশিদিনের কথা নয়।"

এই আলোচনায় যোগ দেওয়া কেউ তার কাছে আশা করে না, তবু আয়া থাকতে পারলে না। বল্‌লে, "ওঁকে না নিলে বাগান বুঝি যেত শুকিয়ে।"

নীরজা আপন মনে বলে চল্‌ল,—"নিয়ুমার্কেটে ভোরবেলাকার ফুলের চালান না পাঠিয়ে আমার এক-দিনও কাট্‌ত না। সেই রকম ফুলের চালান আজও গিয়েছিল, গাড়ির শব্দ শুনেছি। আজকাল চালান কে দেখে দেয় রোশ্‌নি।"

এই জানাকথার কোনো উত্তর করল না আয়া, ঠোঁট চেপে রইল বসে।

নীরজা আয়াকে বল্‌লে "আর যাই হোক, আমি যতদিন ছিলুম, মালীরা ফাঁকি দিতে পারেনি।"

আয়া উঠ্‌ল গুম্‌রিয়ে, বল্‌লে, "সেদিন নেই, এখন লুঠ চল্‌ছে দু'হাতে।"

"সত্যি না কি ?"

"আমি কি মিথ্যা বল্‌ছি ? কলকাতার নতুন বাজারে ক'টা ফুলই বা পৌঁছয়। জামাইবাবু বেরিয়ে গেলেই খিড়কির দরজায় মালীদের ফুলের বাজার বসে যায়।"

"এরা কেউ দেখে না ?"

"দেখ্‌বার গরজ এত কার ?"

"জামাইবাবুকে বলিস্‌নে কেন ?"

"আমি বল্‌বার কে ? মান বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে তো। তুমি বলো না কেন ? তোমারি তো সব।"

"হোক্ না, হোক্ না, বেশ তো। চলুক্ না এমনি কিছুদিন, তার পরে যখন ছারখার হয়ে আস্‌বে আপনি পড়্‌বে ধরা। একদিন বোঝ্‌বার সময় আস্‌বে, মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়। চুপ করে থাক্ না।"

"কিন্তু তাও বলি খোঁখি, তোমার ঐ হলা মালিটাকে দিয়ে কোনো কাজ পাওয়া যায় না।"

হলার কাজে ঔদাসীন্যেই যে আয়ার একমাত্র বিরক্তির কারণ তা নয়, ওর উপরে নীরজার স্নেহ অসঙ্গতরূপে বেড়ে উঠ্‌ছে, এই কারণটাই সব চেয়ে গুরুতর।

নীরজা বল্‌লে, "মালীকে দোষ দিইনে। নতুন মনিবকে সইতে পারবে কেন? ওদের হোলো সাত-পুরুষে মালীগিরি, আর তোমার দিদিমণির বইপড়া বিদ্যে, হুকুম করতে এলে সে কি মানায়? হলা ছিষ্টি-ছাড়া আইন মানতে চায় না, আমার কাছে এসে নালিশ করে। আমি বলি কানে আনিস্‌নে কথা, চুপ করে থাক্।"

"সেদিন জামাইবাবু ওকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল।"

"কেন, কী জন্যে?"

"ও বসে বসে বিড়ি টানছে, আর ওর সামনে বাইরের গোরু এসে গাছ খাচ্চে। জামাইবাবু বল্‌লে, "গোরু তাড়াসনে কেন?" ও মুখের উপর জবাব করলে, "আমি তাড়াব গোরু! গোরুই তো তাড়া করে আমাকে। আমার প্রাণের ভয় নেই!"

শুনে হাস্‌লে নীরজা, বল্‌লে, “ওর ঐরকম কথা! তা যাই হোক্, ও আমার আপন হাতে তৈরি।”

“জামাইবাবু তোমার খাতিরেই তো ওকে সয়ে যায়, তা গোরুই ঢুকুক্ আর গণ্ডারই তাড়া করুক্। এতটা আব্‌দার ভালো নয়, তাও বলি।”

“চুপ কর্ রোশ্‌নি। কী দুঃখে ও গোরু তাড়ায়নি সে কি আমি বুঝিনে। ওর আগুন জ্বলছে বুকে। ঐ যে হলা মাথায় গামছা দিয়ে কোথায় চলেছে। ডাক্ তো ওকে।”

আয়ার ডাকে হলধর মালী এল ঘরে। নীরজা জিজ্ঞাসা কর্‌লে “কী রে, আজকাল নতুন ফরমাস্ কিছু আছে?”

হলা বল্‌লে, “আছে বই কি। শুনে হাসিও পায়, চোখে জলও আসে!”

“কী রকম, শুনি।”

“ঐ যে সামনে মল্লিকদের পুরোনো বাড়ি ভাঙা হচ্চে, ঐখান থেকে ইঁটপাটখেল নিয়ে এসে গাছের তলায় বিছিয়ে দিতে হবে। এই হোলো ওঁর হুকুম। আমি বল্লুম, রোদের বেলায় গরম লাগবে গাছের। কান দেয় না আমার কথায়।”

"বাবুকে বলিস্‌নে কেন ?"

"বাবুকে বলেছিলেম। বাবু ধমক দিয়ে বলে, চুপ করে থাক্‌। বৌদিদি, ছুটি দাও আমাকে, সহ্য হয় না আমার।"

"তাই দেখেছি বটে, ঝুড়ি ক'রে রাবিশ বয়ে আন্‌ছিলি।"

"বৌদিদি, তুমি আমার চিরকালের মনিব। তোমারই চোখের সামনে আমার মাথা হেঁট করে দিলে। দেশের লোকের কাছে আমার জাত যাবে। আমি কি কুলি মজুর ?"

"আচ্ছা এখন যা। তোদের দিদিমণি যখন তোকে ইঁটসুর্‌কি বইতে বল্‌বে আমার নাম করে বলিস্‌ আমি বারণ করেছি। দাঁড়িয়ে রইলি যে।"

"দেশ থেকে চিঠি এসেছে বড়ো হালের গোরুটা মারা গেছে।" বলে মাথা চুল্‌কতে লাগ্‌ল।

নীরজা বল্‌লে, "না মারা যায় নি, দিব্যি বেঁচে আছে। নে দুটো টাকা, আর বেশি বকিস্‌নে।" এই ব'লে, টিপাইয়ের উপরকার পিতলের বাক্স থেকে টাকা বের করে দিলে।

"আবার কী ?"

"বউয়ের জন্যে একখানা পুরানো কাপড়। জয়জয়-কার হবে তোমার।" এই ব'লে পানের ছোপে কালো বর্ণ মুখ প্রসারিত করে হাস্‌লে।

নীরজা বল্‌লে, "রোশ্‌নি, দেতো ওকে আল্‌নার ঐ কাপড়খানা।"

রোশ্‌নি সবলে মাথা নেড়ে বল্‌লে, "সে কী কথা ওযে তোমার ঢাকাই সাড়ি!"

"হোক্ না ঢাকাই সাড়ি। আমার কাছে আজ সব সাড়িই সমান। কবেই বা আর পর্‌ব।"

রোশ্‌নি দৃঢ়মুখ করে বল্‌লে, "না সে হবে না। ওকে তোমার সেই লালপেড়ে কলের কাপড়টা দেব। দেখ্ হলা, খোঁখিকে যদি এমনি জ্বালাতন করিস্ বাবুকে ব'লে তোকে দূর করে তাড়িয়ে দেব।"

হলা নীরজার পা ধরে কান্নার সুরে বল্‌লে, "আমার কপাল ভেঙেছে বৌদিদি।"

"কেনরে কী হয়েছে তোর।"

"আয়াজিকে মাসি বলি আমি। আমার মা নেই, এতদিন জানতেম হতভাগা হলাকে আয়াজি ভালো-বাসেন। আজ বৌদিদি, তোমার যদি দয়া হোলো উনি কেন দেন বাগ্‌ড়া। কারো দোষ নয় আমারি

কপালের দোষ। নইলে তোমার হলাকে পরের হাতে দিয়ে তুমি আজ বিছানায় প'ড়ে।"

"ভয় নেইরে, তোর মাসি তোকে ভালোই বাসে। তুই আসবার আগেই তোর গুণগান করছিল। রোশ্‌নি, দে ওকে ঐ কাপড়টা, নইলে ও ধন্না দিয়ে পড়ে থাকবে।"

অত্যন্ত বিরস মুখে আয়া কাপড়টা এনে ফেলে দিলে ওর সামনে। হলা সেটা তুলে নিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলে। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "এই গামছাটা দিয়ে মুড়ে নিই বৌদিদি। আমার ময়লা হাত, দাগ লাগবে।" সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই আল্‌না থেকে তোয়ালেটা নিয়েই কাপড় মুড়ে দ্রুতপদে হলা প্রস্থান কর্‌লে।

নীরজা আয়াকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আচ্ছা আয়া, তুই ঠিক জানিস্ বাবু বেরিয়ে গেছেন?"

"নিজের চক্ষে দেখলুম। কী তাড়া! টুপিটা নিতে ভুলে গেলেন।"

"আজ এই প্রথম হোলো। আমার সকাল বেলা-কার পাওনা ফুলে ফাঁকি পড়্‌লো। দিনে দিনে এই ফাঁকি বাড়্‌তে থাকবে। শেষকালে আমি গিয়ে পড়্‌ব

আমার সংসারের আঁস্তাকুড়ে, যেখানে নিবে-যাওয়া পোড়া কয়লার জায়গা।”

সরলাকে আসতে দেখে আয়া মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল।

সরলা ঢুক্‌ল ঘরে। তার হাতে একটি অর্‌কিড্‌। ফুলটি শুভ্র, পাপড়ির আগায় বেগ্‌নির রেখা। যেন ডানা-মেলা মস্ত প্রজাপতি। সরলা ছিপ্‌ছিপে লম্বা, সামলা রং, প্রথমেই লক্ষ্য হয় তার বড়ো বড়ো চোখ, উজ্জ্বল এবং করুণ। মোটা খদ্দরের সাড়ি, চুল অযত্নে বাঁধা, শ্লথ বন্ধনে নেমে পড়েছে কাঁধের দিকে। অসজ্জিত দেহ যৌবনের সমাগমকে অনাদৃত করে রেখেছে।

নীরজা তার মুখের দিকে তাকালে না। সরলা ধীরে ধীরে ফুলটি বিছানায় তার সামনে রেখে দিলে।

নীরজা বিরক্তির ভাব গোপন না করেই বল্‌লে, “কে আন্‌তে বলেছে?”

“আদিৎদা।”

“নিজে এলেন না যে?”

“নিয়ুমার্কেটের দোকানে তাড়াতাড়ি যেতে হোলো চা খাওয়া সেরেই।”

“এত তাড়া কিসের?”

"কাল রাত্রে আপিসের তালা ভেঙে টাকা চুরির খবর এসেছে।"

"টানাটানি করে কি পাঁচমিনিটও সময় দিতে পারতেন না?"

"কালরাত্রে তোমার ব্যথা বেড়েছিল। ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। দরজার কাছ পর্য্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন দুপুরের মধ্যে যদি নিজে না আস্‌তে পারেন এই ফুলটি যেন দিই তোমাকে।"

দিনের কাজ আরম্ভের পূর্ব্বেই রোজ আদিত্য বিশেষ বাছাই-করা একটি ক'রে ফুল স্ত্রীর বিছানায় রেখে যেত। নীরজা প্রতিদিন তারই অপেক্ষা করেছে। আজকের দিনের বিশেষ ফুলটি আদিত্য সরলার হাতে দিয়ে গেল। একথা তার মনে আসেনি যে ফুল দেওয়ার প্রধান মূল্য নিজের হাতে দেওয়া। গঙ্গার জল হোলেও নলের ভিতর থেকে তার সার্থকতা থাকে না।

নীরজা ফুলটা অবজ্ঞার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে বল্‌লে, "জানো মার্কেটে এ ফুলের দাম কত! পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট কর্‌বার দরকার কী?" বল্‌তে বল্‌তে গলা ভার হয়ে এল।

সরলা বুঝ্‌লে ব্যাপারখানা। বুঝ্‌লে জবাব দিতে গেলে আক্ষেপের বেগ বাড়্‌বে বই কম্‌বে না। চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। একটু পরে খামখা নীরজা প্রশ্ন কর্‌লে, "জানো এ ফুলের নাম?"

বল্‌লেই হোতো, জানিনে, কিন্তু বোধ করি অভিমানে ঘা লাগ্‌ল, বল্‌লে, "এমারিলিস্‌।"

নীরজা অন্যায় উষ্মার সঙ্গে ধমক দিলে, "ভারি তো জানো তুমি; ওর নাম গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা।"

সরলা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "তা হবে।"

"তা হবে মানে কী। নিশ্চয়ই তাই। বল্‌তে চাও, আমি জানিনে?"

সরলা জান্‌ত নীরজা জেনে শুনেই ভুল নামটা দিয়ে প্রতিবাদ কর্‌লে। অন্যকে জ্বালিয়ে নিজের জ্বালা উপশম করবার জন্যে। নীরবে হার মেনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, নীরজা ফিরে ডাক্‌ল, "শুনে যাও। কী করছিলে সমস্ত সকাল, কোথায় ছিলে?"

"অর্‌কিডের ঘরে।"

নীরজা উত্তেজিত হয়ে বল্‌লে, "অর্‌কিডের ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার এত কী দরকার?"

"পুরোনো অর্কিড্‌ চিরে ভাগ করে নতুন

অর্কিড্ করবার জন্যে আদিৎদা আমাকে বলে গিয়েছিলেন।”

নীরজা বলে উঠ্‌ল ধমক দেওয়ার সুরে—“আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি। আমি নিজের হাতে হলা মালীকে তৈরি করে শিখিয়েছি, তাকে হুকুম কর্‌লে সে কি পার্‌ত না?”

এর উপর জবাব চলে না। এর অকপট উত্তরটা ছিল এই যে, নীরজার হাতে হলা মালীর কাজ চল্‌ত ভালোই, কিন্তু সরলার হাতে একেবারেই চলে না। এমন কি, ওকে সে অপমান করে ঔদাসীন্য দেখিয়ে।

মালী এটা বুঝে নিয়েছিল যে, এ-আমলে ঠিক মতো কাজ না করলেই ও-আমলের মনিব হবেন খুসি। এ যেন কলেজ বয়কট করে পাশ না করার দামটাই ডিগ্রি পাওয়ার চেয়ে বড়ো হয়েছে।

সরলা রাগ করতে পার্‌ত কিন্তু রাগ কর্‌লে না। সে বোঝে বৌদিদির বুকের ভিতরটা টনটন করছে। নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে-বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এই বাগানের থেকে নির্ব্বাসন। চোখের সামনেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ। নীরজা বল্‌লে, “দাও, বন্ধ করে দাও ঐ জানলা।”

সরলা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "এইবার কমলা-লেবুর রস নিয়ে আসি।"

"না কিছু আনতে হবে না, এখন যেতে পারো।"

সরলা ভয়ে ভয়ে বললে, "মকরধ্বজ খাবার সময় হয়েছে।"

"না দরকার নেই মকরধ্বজ। তোমার উপর বাগানের আর কোনো কাজের ফর্‌মাস আছে না কি?"

"গোলাপের ডাল পুঁত্‌তে হবে।"

নীরজা একটু খোঁটা দিয়ে বল্‌লে, "তার সময় এই বুঝি! এ বুদ্ধি তাঁকে দিলে কে, শুনি।"

সরলা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "মফঃস্বল থেকে হঠাৎ অনেক-গুলো অর্ডার এসেছে দেখে কোনোমতে আসছে বর্ষার আগেই বেশি করে গাছ বানাতে পণ করেছেন। আমি বারণ করেছিলুম।"

"বারণ করেছিলে বুঝি! আচ্ছা, আচ্ছা ডেকে দাও হলা মালীকে।"

এল হলা মালী। নীরজা বল্‌লে, "বাবু হয়ে উঠেছ? গোলাপের ডাল পুঁত্‌তে হাতে খিল ধরে। দিদিমণি তোমার এসিষ্টেণ্ট্ মালী না কি? বাবু সহর থেকে ফেরবার আগেই যতগুলো পারিস্ ডাল পুঁতবি,

আজ তোদের ছুটি নেই বলে দিচ্চি। পোড়া ঘাস পাতার সঙ্গে বালি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিস্ ঝিলের ডান পাড়িতে।” মনে মনে স্থির করলে এইখানে শুয়ে শুয়েই গোলাপের গাছ সে তৈরি করে তুলবেই। হলা মালীর আর নিষ্কৃতি নেই।

হঠাৎ হলা প্রশ্রয়ের হাসিতে মুখ ভ’রে বল্‌লে, “বৌদিদি, এই একটা পিতলের ঘটি। কটকের হরসুন্দর মাইতির তৈরি। এ জিনিষের দরদ তুমিই বুঝবে। তোমার ফুলদানি মানাবে ভালো।”

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, “এর দাম কত?”

জিভ কেটে হলা বল্‌লে, “এমন কথা বোলো না। এ ঘটির আবার দাম নেব! গরীব আমি, তা বলে তো ছোটোলোক নই। তোমারই খেয়ে পরে যে মানুষ।”

ঘটি টিপাইয়ের উপর রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজাতে লাগ্‌ল। অবশেষে যাবার-মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, “তোমাকে জানিয়েছি আমার ভাগ্‌নীর বিয়ে। বাজুবন্ধর কথা ভুলো না বৌদিদি। পিতলের গয়না যদি দিই তোমারি নিন্দে হবে। এত-বড়ো ঘরের মালী, তারি ঘরে বিয়ে, দেশসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে।”

নীরজা বল্‌লে, "আচ্ছা তোর ভয় নেই, তুই এখন যা!" হলা চলে গেল। নীরজা হঠাৎ পাশ ফিরে বালিশে মাথা রেখে গুমরে উঠে বলে উঠ্‌ল, "রোশ্‌নি, রোশ্‌নি, আমি ছোটো হয়ে গেছি, ঐ হলা মালীর মতোই হয়েছে আমার মন।"

আয়া বল্‌লে, "ও কী বল্‌ছ খোঁখি, ছি ছি!"

নীরজা আপনিই বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমার পোড়া কপাল আমাকে বাইরে থেকে নামিয়ে দিয়েছে, আবার ভিতর থেকে নামিয়ে দিলে কেন? আমি কি জানিনে আমাকে হলা আজ কী চোখে দেখ্‌ছে। আমার কাছে লাগালাগি করে হাস্‌তে হাস্‌তে বক্‌শিস্‌ নিয়ে চলে গেল। ওকে ডেকে দে! খুব করে ওকে ধম্‌কে দেব, ওর সয়তানি ঘোচাতে হবে।"

আয়া যখন হলাকে ডাকবার জন্যে উঠ্‌ল, নীরজা বল্‌লে, "থাক্ থাক্ আজ থাক্!"

৩

কিছুক্ষণ পরে ওর খুড়তুতো দেওর রমেন এসে বল্‌লে, "বৌদি, দাদা পাঠিয়ে দিলেন। আজ আফিসে কাজের ভিড়, হোটেলে খাবেন, দেরি হবে ফির্‌তে।"

নীরজা হেসে বল্‌লে, "খবর দেবার ছুতো করে এক দৌড়ে ছুটে এসেছ ঠাকুরপো। কেন আফিসের বেহারাটা মরেছে বুঝি ?"

"তোমার কাছে আস্‌তে তুমি ছাড়া অন্য ছুতোর দরকার কিসের বৌদি ? বেহারা বেটা কী বুঝবে এই দূত-পদের দরদ।"

"ওগো মিষ্টি ছড়াচ্ছ অস্থানে। এ ঘরে এসেছ কোন্‌ ভুলে ? তোমার মালিনী আছেন আজ একাকিনী নেবু কুঞ্জবনে, দেখো গে যাও।"

"কুঞ্জবনের বনলক্ষ্মীকে দর্শনী দিই আগে, তারপরে যাব মালিনীর সন্ধানে।" এই বলে বুকের পকেট থেকে একখানা গল্পের বই বের করে নীরজার হাতে দিল।

নীরজা খুসি হয়ে বল্‌লে, "অশ্রু-শিকল" এই বইটাই চাচ্ছিলুম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মালঞ্চের মালিনী চিরদিন বুকের কাছে বাঁধা থাক্ হাসির শিকলে। ঐ যাকে তুমি বলো তোমার কল্পনার দোসর তোমার স্বপ্ন-সঙ্গিনী। কী সোহাগ গো।"

রমেন হঠাৎ বললে, "আচ্ছা বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিয়ো।"

"কী কথা?"

"সরলার সঙ্গে আজ কি তোমার ঝগড়া হয়ে গেছে?"

"কেন বলো তো?"

দেখলুম ঝিলের ধারে ঘাটে চুপ করে সে বসে আছে। মেয়েদের তো পুরুষদের মতো কাজ-পালানো উড়ো মন নয়। এমন বেকার দশা আমি সরলার কোনোদিন দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলুম, 'মন কোন্‌দিকে?' ও বল্‌লে, 'যেদিকে তপ্ত হাওয়া শুক্‌নো পাতা ওড়ায় সেইদিকে।' আমি বললুম, 'ওটা হোলো হেঁয়ালি। স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।' সে বল্‌লে, 'সব কথারই ভাষা আছে?' আবার দেখি হেঁয়ালি। তখন গানের বুলিটা মনে পড়্‌ল "কাহার বচন দিয়েছে বেদন।"

"হয়তো তোমার দাদার বচন।"

"হোতেই পারে না। দাদা যে পুরুষ মানুষ। সে তোমার ঐ মালীগুলিকে হুঙ্কার দিতে পারে। কিন্তু "পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ" এও কি সম্ভব হয়?"

"আচ্ছা বাজে কথা বক্‌তে হবে না। একটা কাজের কথা বলি, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। দোহাই তোমার, সরলাকে তুমি বিয়ে করো। আই-বড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।"

"পুণ্যের লোভ রাখিনে কিন্তু ঐ কন্যার লোভ রাখি, একথা বলছি তোমার কাছে হলফ ক'রে।"

"তা হোলে বাধাটা কোথায়? ওর কি মন নেই?"

"সে কথা জিজ্ঞাসাও করিনি। বলেইছি-তো ও আমার কল্পনার দোসরই থাকবে, সংসারের দোসর হবে না।"

হঠাৎ তীব্র আগ্রহের সঙ্গে নীরজা রমেনের হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "কেন হবে না, হোতেই হবে। মরবার আগে তোমার বিয়ে দেখ্‌বই, নইলে ভূত হয়ে তোমাদের জ্বালাতন কর্‌ব বলে রাখছি।"

নীরজার ব্যগ্রতা দেখে রমেন বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে রইল চেয়ে। শেষকালে মাথা নেড়ে বল্‌লে, "বৌদি, আমি সম্পর্কে ছোটো, কিন্তু বয়সে বড়ো। উড়ো বাতাসে আগাছার বীজ আসে ভেসে, প্রশ্রয় পেলে শিকড় ছড়ায়, তারপরে আর ওপড়ায় কার সাধ্যি।"

"আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। আমি তোমার গুরুজন, তোমাকে উপদেশ দিচ্চি, বিয়ে করো। দেরি কোরো না। এই ফাল্গুন মাসে ভালো দিন আছে।"

"আমার পাঁজিতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ভালো দিন। কিন্তু দিন যদি বা থাকে, রাস্তা নেই। আমি একবার গেছি জেলে, এখনো আছি পিছল পথে জেলের কবলটার দিকে। ও-পথে প্রজাপতির পেয়াদার চল নেই।"

"এখনকার মেয়েরাই বুঝি জেলখানাকে ভয় করে?"

"না করতে পারে কিন্তু সপ্তপদী গমনের রাস্তা ওটা নয়। ও রাস্তায় বধূকে পাশে না রেখে মনের মধ্যে রাখলে জোর পাওয়া যায়। রইল চিরদিন আমার মনে।"

হরলিক্‌স্ দুধের পাত্র টিপাইয়ের উপর রেখে সরলা চলে যাচ্ছিল। নীরজা বল্‌লে, "যেয়ো না, শোনো সরলা, এই ফোটোগ্রাফ্‌টা কার? চিনতে পারো?"

সরলা বল্‌লে, "ও তো আমার।"

"তোমার সেই আগেকার দিনের ছবি। যখন তোমার জ্যাঠামশায়ের ওখানে তোমরা দুজনে বাগানের কাজ কর্‌তে। দেখে মনে হচ্চে, বয়সে পনেরো হবে। মরাঠি মেয়ের মতো মালকোঁচা দিয়ে সাড়ি পরেছ।"

"এ তুমি কোথা থেকে পেলে?"

"দেখেছিলুম ওর একটা ডেস্কের মধ্যে, তখন ভালো করে লক্ষ্য করিনি। আজ সেখান থেকে আনিয়ে নিয়েছি। ঠাকুরপো, তখনকার চেয়ে সরলাকে এখন আরো অনেক ভালো দেখ্‌তে হয়েছে। তোমার কী মনে হয়।"

রমেন বল্‌লে, "তখন কি কোনো সরলা কোথাও ছিল? অন্তত আমি তাকে জানতুম না। আমার কাছে এখনকার সরলাই একমাত্র সত্য। তুলনা কর্‌ব কিসের সঙ্গে?"

নীরজা বল্‌লে, "ওর এখনকার চেহারা হৃদয়ের কোন একটা রহস্যে ঘন হয়ে ভরে উঠেছে—যেন যে

মেঘ ছিল সাদা তার ভিতর থেকে শ্রাবণের জল আজ ঝরি ঝরি করছে—একেই তোমরা রোম্যান্টিক্ বলো, না ঠাকুরপো ?”

সরলা চলে যেতে উদ্যত হোলো, নীরজা তাকে বল্‌লে, “সরলা, একটু বোসো। ঠাকুরপো, একবার পুরুষ মানুষের চোখ দিয়ে সরলাকে দেখে নিই। ওর কী সকলের আগে চোখে পড়ে বলো দেখি ?”

রমেন বল্‌লে, “সমস্তটাই একসঙ্গে।”

“নিশ্চয়ই ওর চোখ ছুটো ; কেমন একরকম গভীর করে চাইতে জানে। না, উঠো না সরলা। আর একটু বোসো। ওর দেহটাও কেমন নিরেট নিটোল।”

“তুমি কি ওকে নীলেম করতে বসেছ নাকি বৌদি ? জানোই তো অমনিতেই আমার উৎসাহের কিছু কম্‌তি নেই।”

নীরজা দালালির উৎসাহে বলে উঠ্‌ল, “ঠাকুরপো, দেখো সরলার হাত ছুখানি, যেমন জোরালো তেমনি সুডোল, কোমল, তেমনি তার শ্রী। এমনটি আর দেখেছ ?”

রমেন হেসে বল্‌লে, “আর কোথাও দেখেছি কিনা তার উত্তরটা তোমার মুখের সামনে রূঢ় শোনাবে।”

"অমন দুটি হাতের 'পরে দাবী করবে না ?"

"চিরদিনের দাবী নাই করলেম, ক্ষণে ক্ষণে দাবী করে থাকি। তোমাদের ঘরে যখন চা খেতে আসি তখন চায়ের চেয়ে বেশি কিছু পাই ঐ হাতের গুণে। সেই রসগ্রহণে পাণিগ্রহণের যেটুকু সম্পর্ক থাকে অভাগার পক্ষে সেই যথেষ্ট।"

সরলা মোড়া ছেড়ে উঠে পড়্‌ল। ঘর থেকে বেরোবার উপক্রম করতেই রমেন দ্বার আগ্‌লে বল্‌লে, "একটা কথা দাও তবে পথ ছাড়্‌ব।"

"কী বলো ?"

"আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী। আমি মুসাফির আস্‌ব তোমার বাগিচায়, কথা যদি থাকে তবু কইবার দরকারই হবে না। আকাল পড়েছে, পেট ভরে দেখাই জোটে না। হঠাৎ এই ঘরে মুষ্টিভিক্ষার দেখা,—এ মঞ্জুর নয়। আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে সয়ে মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।"

সরলা সহজ সুরেই বল্‌লে, "আচ্ছা এসো তুমি।"

রমেন খাটের কাছে ফিরে এসে বল্‌লে, "তবে আসি বৌদি।"

"আর থাকবার দরকার কী? বৌদিদির যে কাজটুকু ছিল, সে তো সারা হোলো।"

রমেন চলে গেল।

৪

রমেন চলে গেলে নীরজা হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বিছানায় পড়ে রইল। ভাবতে লাগ্‌ল, এমন মন-মাতানো দিন তারও ছিল। কত বসন্তের রাতকে সে উতলা করেছে। সংসারের বারো আনা মেয়ের মতো সে কি ছিল স্বামীর ঘরকন্নার আস্‌বাব। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলি মনে পড়ে, কতদিন তার স্বামী তার অলক ধরে টেনে আর্দ্রকণ্ঠে বলেছে "আমার রং-মহলের সাকি।" দশ বছরে রং একটু ম্লান হয়নি, পেয়ালা ছিল ভরা। তার স্বামী তাকে বল্‌ত, "সেকালে মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া লেগে ফুল ধর্‌ত অশোকে, মুখমদের ছিটে পেলে বকুল উঠ্‌ত ফুটে, আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা। যে পথে রোজ তোমার পা পড়ে, তারি ছু-ধারে ফুল ফুটেছে রঙে রঙে, বসন্তের হাওয়ায় দিয়েছ মদ ছড়িয়ে, গোলাপ বনে লেগেছে তার নেশা।" কথায় কথায় সে বল্‌ত, "তুমি

না থাকলে এই ফুলের স্বর্গে বেনের দোকান বৃত্রাসুর হয়ে দখল জমাতো। আমার ভাগ্যগুণে তুমি আছ নন্দন-বনের ইন্দ্রাণী।" হায়রে, যৌবন তো আজও ফুরোয়নি কিন্তু চলে গেল তার মহিমা। তাই তো ইন্দ্রাণী আপন আসন আজ ভরাতে পারছে না। সেদিন ওর মনে কোথাও কি ছিল লেশমাত্র ভয়? সে যেখানে ছিল সেখানে আর কেউই ছিল না, ওর আকাশে ও ছিল সকাল বেলার অরুণোদয়ের মতো পরিপূর্ণ একা। আজ কোনোখানে একটু ছায়া দেখলেই বুক দুরদুর করে উঠ্‌ছে, নিজের উপর আর ভরসা নেই। নইলে কে ঐ সরলা, কিসের ওর গুমর? আজ তাকে নিয়েও সন্দেহে মন দুলে উঠ্‌ছে। কে জান্‌ত বেলা না ফুরোতেই এত দৈন্য ঘট্‌বে কপালে। এতদিন ধরে এত সুখ এত গৌরব অজস্র দিয়ে অবশেষে বিধাতা এমন ক'রে চোরের মতো সিঁধ কেটে দত্তাপহরণ করলেন!

"রোশ্‌নি, শুনে যা!"

"কী খোঁখি?"

"তোদের জামাইবাবু একদিন আমাকে ডাক্‌ত রংমহলের রঙ্গিনী। দশবছর আমাদের বিয়ে হয়েছে সেই রং তো এখনও ফিকে হয় নি, কিন্তু সেই রংমহল?"

"যাবে কোথায়, আছে তোমার মহল। কাল তুমি সারারাত ঘুমোওনি, একটু ঘুমোও তো, পায়ে হাত বুলিয়ে দিই।"

"রোশ্‌নি, আজ তো পূর্ণিমার কাছাকাছি। এমন কত জ্যোৎস্না রাত্রে ঘুমোইনি। দুজনে বেড়িয়েছি বাগানে। সেই জাগা আর এই জাগা। আজ তো ঘুমোতে পারলে বাঁচি, কিন্তু পোড়া ঘুম আস্‌তে চায় না যে।"

"একটু চুপ করে থাকো দেখি, ঘুম আপনি আসবে।"

"আচ্ছা ওরা কি বাগানে বেড়ায় জ্যোৎস্নারাত্রে?"

"ভোরবেলাকার চালানের জন্য ফুল কাট্‌তে দেখেছি। বেড়াবে কখন, সময় কোথায়?"

"মালীগুলো আজকাল খুব ঘুমোচ্চে। তা হোলে মালিদের বুঝি জাগায় না ইচ্ছে করেই?"

"তুমি নেই এখন ওদের গায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি!"

"ঐ না শুনলেম গাড়ির শব্দ?"

"হাঁ বাবুর গাড়ি এল।"

"হাতআয়নাটা এগিয়ে দে। বড়ো গোলাপটা নিয়ে আয় ফুলদানী থেকে, সেফ্‌টিপিনের বাক্সটা

কোথায় দেখি। আজ আমার মুখ বড়ো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যা তুই ঘর থেকে।"

"যাচ্চি কিন্তু দুধ বার্লি পড়ে আছে, খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি।"

"থাক্ পড়ে, খাব না।"

"দু'দাগ ওষুধ তোমার আজ খাওয়া হয়নি।"

"তোর বক্‌তে হবে না, তুই যা বলছি, ঐ জানলাটা খুলে দিয়ে যা।"

আয়া চলে গেল।

ঢং ঢং করে তিনটে বাজ্‌ল। আরক্ত হয়ে এসেছে রোদ্দুরের রং, ছায়া হেলে পড়েছে পূবদিকে, বাতাস এল দক্ষিণ থেকে, ঝিলের জল উঠ্‌ল টল টল করে। মালীরা লেগেছে কাজে, নীরজা দূর থেকে যতটা পারে তাই দেখে।

দ্রুতপদে আদিত্য ছুটে এল ঘরে। হাত জোড়া বাসন্তী রংএর দেশী ল্যাবার্ণাম্ ফুলের মঞ্জরীতে। তাই দিয়ে ঢেকে দিল নীরজার পায়ের কাছটা। বিছানায় বসেই তার হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "আজ কতক্ষণ তোমাকে দেখিনি নীরু।" শুনে নীরজা আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। আদিত্য

খাটের থেকে নেমে মেজের উপর হাঁটু গেড়ে নীরজার গলা জড়িয়ে ধর্‌লে, তার ভিজে গালে চুমো খেয়ে বল্‌লে, "মনে মনে তুমি নিশ্চয় জানো আমার দোষ ছিল না।"

"অত নিশ্চয় ক'রে কী ক'রে জান্‌ব বলো? আমার কি আর সেদিন আছে?"

"দিনের কথা হিসেব করে কী হবে? তুমি তো আমার সেই তুমিই আছ।"

"আজ যে আমার সকলতাতেই ভয় করে। জোর পাইনে যে মনে।"

"অল্প একটু ভয় করতে ভালো লাগে। না? খোঁটা দিয়ে আমাকে একটুখানি উস্‌কিয়ে দিতে চাও। এ চাতুরী মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ।"

"আর ভুলে-যাওয়া বুঝি পুরুষদের স্বভাবসিদ্ধ নয়?"

"ভুলতে ফুরসৎ দাও কই!"

"বোলো না বোলো না, পোড়া বিধাতার শাপে লম্বা ফুরসৎ দিয়েছি যে।"

"উল্টো বল্‌লে। সুখের দিনে ভোলা যায়, ব্যথার দিনে নয়।"

"সত্যি বলো আজ সকালে তুমি ভুলে চলে যাও নি ?"

"কী কথা বলো তুমি। চলে যেতে হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ না ফিরেছি মনে স্বস্তি ছিল না।"

"কেমন করে বসেছ তুমি। তোমার পা ছুটো বিছানায় তোলো।"

"বেড়ি দিতে চাও পাছে পালাই !"

"হাঁ বেড়ি দিতে চাই। জনমে মরণে তোমার পা ছুখানি নিঃসন্দেহে রইল আমার কাছে বাঁধা।"

"মাঝে মাঝে একটু একটু সন্দেহ কোরো, তাতে আদরের স্বাদ বাড়ায়।"

"না, একটুও সন্দেহ না। এতটুকুও না। তোমার মতো এমন স্বামী কোন্ মেয়ে পেয়েছে ? তোমাকেও সন্দেহ, তাতে যে আমাকেই ধিক্কার।"

"আমিই তা হোলে তোমাকে সন্দেহ করব, নইলে জমবে না নাটক।"

"তা কোরো, কোনো ভয় নেই। সেটা হবে প্রহসন।"

"যাই বলো আজ কিন্তু রাগ করছিলে আমার 'পরে !"

"কেন আবার সে কথা? শাস্তি তোমার দিতে হবে না—নিজের মধ্যেই তার দণ্ডবিধান।"

"দণ্ড কিসের জন্য? রাগের তাপ যদি মাঝে মাঝে দেখা না দেয় তা হোলো বুঝ্‌ব ভালোবাসার নাড়ি ছেড়ে গেছে।"

"যদি কোনও দিন ভুলে তোমার উপরে রাগ করি, নিশ্চয় জেনো সে আমি নয়, কোনো অপদেবতা আমার উপরে ভর করেছে।"

"অপদেবতা আমাদের সকলেরই একটা করে থাকে, মাঝে মাঝে অকারণে জানান দেয়। সুবুদ্ধি যদি আসে, রাম নাম করি, দেয় সে দৌড়।"

আয়া ঘরে এল। বল্‌লে, "জামাইবাবু, আজ সকাল থেকে খোঁখী দুধ খায়নি, ওষুধ খায়নি, মালিশ করেনি। এমন করলে আমরা ওর সঙ্গে পার্‌ব না।" বলেই হন্ হন্ করে হাত দুলিয়ে চলে গেল।

শুনেই আদিত্য দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে "এবার তবে আমি রাগ করি।"

"হাঁ করো, খুব রাগ করো, যত পারো রাগ করো, অন্যায় করেছি, কিন্তু মাপ কোরো তারপরে।"

আদিত্য দরজার কাছে এসে ডাক দিতে লাগ্‌ল—
"সরলা, সরলা।"

শুনেই নীরজার শিরায় শিরায় যেন ঝন্‌ ঝন্‌ করে উঠ্‌ল। বুঝ্‌লে, বেঁধানো কাঁটায় হাত পড়েছে। সরলা এল ঘরে। আদিত্য বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন কর্‌লে, "নীরুকে ওষুধ দাওনি আজ, সারাদিন কিছু খেতেও দেওয়া হয়নি?" নীরজা বলে উঠ্‌ল, "ওকে বক্‌ছ কেন? ওর দোষ কী? আমিই দুষ্টুমি করে খাইনি, আমাকে বকো না। সরলা তুমি যাও। মিছে কেন দাঁড়িয়ে বকুনি খাবে?"

"যাবে কী, ওষুধ বের করে দিক্। হরলিক্‌স্ মিল্ক্ তৈরি করে আনুক্।"

"আহা সমস্ত দিন ওকে মালীর কাজে খাটিয়ে মারো তার উপরে আবার নার্সের কাজ কেন? একটু দয়া হয় না তোমার মনে? আয়াকে ডাকো না।"

"আয়া কি ঠিকমতো পার্‌বে এ সব কাজ?"

"ভারি তো কাজ, খুব পার্‌বে! আরো ভালোই পারবে।"

"কিন্তু"—

"কিন্তু আবার কিসের। আয়া আয়া!"

"অত উত্তেজিত হোয়ো না। একটা বিপদ ঘটাবে দেখ্‌ছি।"

"আমি আয়াকে ডেকে দিচ্চি" বলে সরলা চলে গেল। নীরজার কথার যে একটা প্রতিবাদ করবে, সেও তার মুখে এল না। আদিত্যও মনে মনে আশ্চর্য্য হোলো, ভাব্‌লে সরলাকে কি সত্যিই অন্যায় খাটানো হচ্চে!

ওষুধ পথ্য হয়ে গেলে আদিত্য আয়াকে বল্‌লে "সরলা দিদিকে ডেকে দাও।"

"কথায় কথায় কেবলি সরলাদিদি, বেচারাকে তুমি অস্থির করে তুলবে দেখছি।"

"কাজের কথা আছে।"

"থাক্ না এখন কাজের কথা!"

"বেশিক্ষণ লাগবে না।"

"সরলা মেয়েমানুষ, ওর সঙ্গে এত কাজের কথা কিসের, তার চেয়ে হলা মালীকে ডাকো না।"

"তোমাকে বিয়ে করবার পর থেকে একটা কথা আবিষ্কার করেছি যে, মেয়েরাই কাজের, পুরুষেরা হাড়ে অকেজো। আমরা কাজ করি দায়ে পড়ে, তোমরা কাজ করো প্রাণের উৎসাহে। এই সম্বন্ধে

একটা থীসিস্ লিখ্‌ব মনে করেছি। আমার ডায়রি থেকে বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যাবে।"

"সেই মেয়েকেই আজ তার প্রাণের কাজ থেকে বঞ্চিত করেছে যে-বিধাতা, তাকে কী বলে নিন্দে কর্‌ব। ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছে ভেঙে, তাইতো পোড়ো বাড়িতে ভূতের বাসা হোলো।"

সরলা এল। আদিত্য জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "অর্কিড্ ঘরের কাজ হয়ে গেছে?"

"হাঁ হয়ে গেছে।"

"সবগুলো?"

"সবগুলোই।"

"আর গোলাপের কাটিং?"

"মালি তার জমি তৈরি করেছে।"

"জমি! সে তো আমি আগেই তৈরী করে রেখেছি। হলা মালীর উপর ভার দিয়েছ, তা হোলেই দাঁতন কাঠির চাষ হবে আর কী!"

কথাটাতে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে নীরজা বল্‌লে, "সরলা, যাও তো, কমলালেবুর রস করে নিয়ে এসো গে, তাতে একটু আদার রস দিয়ো, আর মধু।"

সরলা মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তুমি ভোরে উঠেছিলে যেমন আমরা রোজ উঠতুম ?"

"হাঁ উঠেছিলুম।"

"ঘড়িতে তেমনি এলার্মের দম দেওয়া ছিল ?"

"ছিল বৈ কী ?"

"সেই নীমগাছতলায় সেই কাটা গাছের গুঁড়ি। তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম। সব ঠিক রেখেছিল বাসু ?"

"রেখেছিল। নইলে খেসারতের দাবীতে নালিশ রুজু করতুম তোমার আদালতে।"

"দুটো চৌকিই পাতা ছিল ?"

"পাতা ছিল সেই আগেকার মতোই। আর ছিল সেই নীল-পাড়-দেওয়া বাসন্তী রংএর চায়ের সরঞ্জাম; দুধের জ্যাগ রূপোর, ছোটো সাদা পাথরের বাটিতে চিনি, আর ড্রাগন-আঁকা জাপানী ট্রে।"

"অন্য চৌকিটা খালি রাখলে কেন ?"

"ইচ্ছে করে রাখিনি। আকাশে তারাগুলো গোণাগুণতি ঠিকই ছিল, কেবল শুক্ল পঞ্চমীর চাঁদ রইল দিগন্তের বাইরে। সুযোগ থাকলে তাকে আনতেম ধরে।"

"সরলাকে কেন ডাকো না তোমার চায়ের টেবিলে ?"

এর উত্তরে বললেই হোতো, তোমার আসনে আর কাউকে ডাক্‌তে মন যায় না। সত্যবাদী তা না ব'লে বল্‌লে, "সকালবেলায় বোধ হয় সে জপ তপ কিছু করে, আমার মতো ভজনপূজনহীন ম্লেচ্ছ তো নয়।"

"চা খাওয়ার পরে আজ বুঝি অর্কিড্‌ঘরে তাকে নিয়ে গিয়েছিলে ?"

"হাঁ, কিছু কাজ ছিল, ওকে বুঝিয়ে দিয়েই ছুট্‌তে হোলো দোকানে।"

"আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরলার সঙ্গে রমেনের বিয়ে দাও না কেন ?"

"ঘটকালি কি আমার ব্যবসা ?"

"না, ঠাট্টা নয়। বিয়ে তো কর্‌তেই হবে, রমেনের মতো পাত্র পাবে কোথায় ?"

"পাত্র আছে একদিকে, পাত্রীও আছে আর-এক দিকে, মাঝখানটাতে মন আছে কি না সে খবর নেবার ফুরসৎ পাইনি। দূরের থেকে মনে হয় যেন ঐখানটাতেই খট্‌কা।"

একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বল্‌লে নীরজা—"কোনো খট্‌কা থাক্‌ত না যদি তোমার সত্যিকার আগ্রহ থাক্‌ত।"

"বিয়ে করবে অন্য পক্ষ, সত্যিকার আগ্রহটা থাকবে একা আমার, এটাতে কি কাজ চলে? তুমি চেষ্টা দেখো না।"

"কিছুদিন গাছপালা থেকে ঐ মেয়েটার দৃষ্টিটাকে ছুটি দাও দেখি, ঠিক জায়গায় আপনি চোখ পড়্‌বে।"

"শুভদৃষ্টির আলোতে গাছপালা পাহাড় পর্ব্বত সমস্তই স্বচ্ছ হয়ে যায়। ও একজাতের এক্‌স্‌রেজ্‌ আর কী।"

"মিছে বক্‌ছ। আসল কথা, তোমার ইচ্ছে নয় বিয়েটা ঘটে।"

"এতক্ষণে ধরেছ ঠিক। সরলা গেলে আমার বাগানের দশা কী হবে বলো। লাভ লোকসানের কথাটাও ভাব্‌তে হয়। ও কী ও, হঠাৎ তোমার বেদনাটা বেড়ে উঠ্‌ল না কি?"

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌ল আদিত্য। নীরজা রুক্ষ গলায় বল্‌লে, "কিছু হয় নি। আমার জন্যে তোমাকে অত ব্যস্ত হোতে হবে না।"

স্বামী যখন উঠি-উঠি করছে, সে বলে উঠ্‌ল "আমাদের বিয়েব পরেই ঐ অর্কিড্‌ ঘরের প্রথম পত্তন, ভুলে যাওনি তো সে কথা? তারপরে দিনে দিনে

আমরা দুজনে মিলে ঐ ঘরটাকে সাজিয়ে তুলেছি। ওটাকে নষ্ট করতে দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না!"

আদিত্য বিস্মিত হয়ে বললে, "সে কেমন কথা? নষ্ট হোতে দেবার সখ আমার দেখ্‌লে কোথায়?"

উত্তেজিত হয়ে নীরজা বল্‌লে, "সরলা কী জানে ফুলের বাগানের!"

"বলো কী? সরলা জানে না? যে-মেসোমশায়ের ঘরে আমি মানুষ, তিনি যে সরলার জ্যাঠামশায়। তুমি তো জানো তাঁরি বাগানে আমার হাতেখড়ি। জ্যাঠামশায় বলতেন, ফুলের বাগানের কাজ মেয়েদেরি, আর গোরু দোওয়ানো। তাঁর সব কাজে ও ছিল তাঁর সঙ্গিনী।"

"আর তুমি ছিলে সঙ্গী।"

"ছিলেম বৈ কী। কিন্তু আমাকে করতে হোতো কলেজের পড়া, ওর মতো অত সময় দিতে পারিনি। ওকে মেসোমশায় নিজে পড়াতেন।"

"সেই বাগান নিয়ে তোমার মেসোমশায়ের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। এমনি ও-মেয়ের পয়। আমার তো তাই ভয় করে। অলক্ষুণে মেয়ে। দেখো না মাঠের মতো কপাল, ঘোড়ার মতন লাফিয়ে চলন। মেয়ে মানুষের পুরুষালি বুদ্ধিটা ভালো নয়। ওতে অকল্যাণ ঘটায়।"

"তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো নীরু? কী কথা বল্‌ছ? মেসোমশায় বাগান করতেই জানতেন, ব্যবসা করতে জানতেন না। ফুলের চাষ কর্‌তে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, নিজের লোকসান করতেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। সকলের কাছে তিনি নাম পেতেন দাম পেতেন না। বাগান করবার জন্যে আমাকে যখন মূলধনের টাকা দিয়েছিলেন আমি কি জানতুম তখনি তাঁর তহবিল ডুবোডুবো। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তাঁর মরবার আগেই সমস্ত দিয়েছি শোধ করে।"

সরলা কমলানেবুর রস নিয়ে এল। নীরজা বল্‌লে, "ঐখানে রেখে যাও।" রেখে সরলা চলে গেল। পাত্রটা পড়ে রইল, ও ছুঁলোই না।

"সরলাকে তুমি বিয়ে কর্‌লে না কেন?"

"শোনো একবার কথা। বিয়ের কথা কোনোদিন মনেও আসেনি।"

"মনেও আসেনি! এই বুঝি তোমার কবিত্ব!"

"জীবনে কবিত্বের বালাই প্রথম দেখা দিল যেদিন তোমাকে দেখলুম। তার আগে আমরা দুই বুনোয় মিলে দিন কাটিয়েছি বনের ছায়ায়। নিজেদের ছিলুম

ভুলে। হাল আমলের সভ্যতায় যদি মানুষ হতুম তা হোলে কী হোতো বলা যায় না।”

“কেন সভ্যতার অপরাধটা কী?”

“এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মতো হৃদয়ের বস্ত্রহরণ করতে চায়। অনুভব করবার পূর্ব্বেই সেযানা করে তোলে চোখে আঙুল দিয়ে। গন্ধের ইসারা ওর পক্ষে বেশি সূক্ষ্ম, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে।”

“সরলাকে তো দেখতে মন্দ নয়।”

“সরলাকে জানতুম সরলা বলেই। ও দেখতে ভালো কি মন্দ সে তত্ত্বটা সম্পূর্ণ বাহুল্য ছিল।”

“আচ্ছা, সত্যি বলো, ওকে তুমি ভালোবাস্‌তে না?”

“নিশ্চয় ভালোবাসতুম। আমি কি জড় পদার্থ, যে, ওকে ভালোবাস্‌ব না? মেসোমশায়ের ছেলে রেঙ্গুনে ব্যারিষ্টারী করে, তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। তাঁর বাগানটি নিয়ে সরলা থাক্‌বে এই ছিল তাঁর জীবনের সাধ। এমন কি তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই বাগানই ওর সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার কর্‌বে। ওর বিয়ে করবার গরজ থাকবে না। তারপরে তিনি চলে গেলেন, অনাথা হোলো সরলা, পাওনাদারের হাতে বাগানটি গেল বিকিয়ে। সেদিন আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল, দেখোনি

কি তুমি ? ও যে ভালোবাস্‌বার জিনিষ, ভালোবাস্‌ব না ওকে ? মনে তো আছে একদিন সরলার মুখে হাসিখুসি ছিল উচ্ছ্বসিত। মনে হোতো যেন পাখীর ওড়া ছিল ওর পায়ের চলার মধ্যে। আজ ও চলেছে বুকভরা বোঝা বয়ে বয়ে, তবু ভেঙে পড়েনি। একদিনের জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নি আমারও কাছে, নিজেকে তার অবকাশও দিলে না।”

আদিত্যের কথা চাপা দিয়ে নীরজা বল্‌লে, “থামো গো থামো, অনেক শুনেছি ওর কথা তোমার কাছে, আর বল্‌তে হবে না। অসামান্য মেয়ে। সেইজন্যে বল্‌ছি ওকে সেই বারাসতের মেয়ে-স্কুলের হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌ করে দাও। তারা তো কতবার ধরাধরি করেছে।”

“বারাসতের মেয়ে ইস্কুল ? কেন আণ্ডামানও তো আছে।”

“না, ঠাট্টা নয়। সরলাকে তোমার বাগানের আর যে-কোনো কাজ দিতে হয় দিয়ো কিন্তু ঐ আর্কিড্‌ ঘরের কাজ দিতে পারবে না।”

“কেন হয়েছে কী ?”

“আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, সরলা অর্কিড্‌ ভালো বোঝে না।”

"আমিও তোমাকে বল্‌ছি, আমার চেয়ে সরলা ভালো বোঝে। মেসোমশায়ের প্রধান সখ ছিল অর্‌কিডে। তিনি নিজের লোক পাঠিয়ে সেলিবিস্‌ থেকে, জাভা থেকে, এমন কি চীন থেকে অর্কিড্‌ আনিয়েছেন, তার দরদ বোঝে এমন লোক তখন ছিল না।"

কথাটা নীরজা জানে, সেই জন্যে কথাটা তার অসহ্য।

"আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ বেশ, ও না হয় আমার চেয়ে ঢের ভালো বোঝে এমন কি তোমার চেয়েও। তা হোক্‌, তবু বল্‌ছি ঐ অর্কিডের ঘর শুধু তোমার আমার, ওখানে সরলার কোনো অধিকার নেই। তোমার সমস্ত বাগানটা ওকেই দিয়ে দাও না যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছে হয়; কেবল খুব অল্প একটু কিছু রেখো যেটুকু কেবল আমাকেই উৎসর্গ-করা। এতকাল পরে অন্তত এইটুকু দাবী করিতে পারি। কপালদোষে না হয় আজ আছি বিছানায় পড়ে, তাই বলে—" কথা শেষ করতে পার্‌লে না, বালিশে মুখ গুঁজে অশান্ত হয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল আদিত্য। ঠিক যেন এতদিন

স্বপ্নে চল্‌ছিল, ঠোকর খেয়ে উঠ্‌ল চম্‌কে। এ কী ব্যাপার। বুঝতে পার্‌ল এই কান্না অনেকদিনকার। বেদনার ঘূর্ণিবাতাস নীরজার অন্তরে অন্তরে বেগ পেয়ে উঠ্‌ছিল দিনে দিনে, আদিত্য জান্‌তে পারেনি মুহূর্ত্তের জন্যেও। এমন নির্ব্বোধ যে, মনে করেছিল, সরলা বাগানের যত্ন কর্‌তে পারে এতে নীরজা খুসি। বিশেষত ঋতুর হিসাব ক'রে বাছাই-করা ফুলের কেয়ারী সাজাতে ও অদ্বিতীয়। আজ হঠাৎ মনে পড়্‌ল, একদিন যখন কোনও উপলক্ষ্যে সরলার প্রশংসা ক'রে ও বলেছিল, "কামিনীর বেড়া এমন মানানসই ক'রে আমি তো লাগাতে পারতুম না", তখন তীব্র হেসে বলেছে নীরজা, "ওগো মশায়, উচিত পাওনার চেয়ে বেশি দিলে আখেরে মানুষের লোকসান করাই হয়।" আদিত্যের আজ মনে পড়্‌ল, গাছপালা সম্বন্ধে কোনও মতে সরলার একটা ভুল যদি ধর্‌তে পার্‌ত নীরজা উচ্চহাস্যে কথাটাকে ফিরে ফিরে মুখরিত করে তুল্‌ত। স্পষ্ট মনে পড়্‌ল, ইংরেজি বই খুঁজে খুঁজে নীরজা মুখস্থ করে রাখ্‌ত অল্পপরিচিত ফুলের উদ্ভট নাম; ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা কর্‌ত সরলাকে, যখন সে ভুল কর্‌ত, তখন থামতে চাইত না ওর হাসির হিল্লোল; "ভারি পণ্ডিত, কে না জানে

ওর নাম ক্যাসিয়া জাভানিকা। আমার হলা মালীও বল্‌তে পারত।"

আদিত্য অনেকক্ষণ ধরে বসে ভাব্‌লে। তারপরে হাত ধরে বল্‌লে, "কেঁদো না নীরু, বলো কী কর্‌ব। তুমি কি চাও সরলাকে বাগানের কাজে না রাখি ?"

নীরজা হাত ছিনিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "কিছু চাইনে, কিচ্ছু না, ও তো তোমারি বাগান। তুমি যাকে খুসি রাখ্‌তে পারো আমার তাতে কী ?"

"নীরু, এমন কথা তুমি বল্‌তে পার্‌লে, আমারই বাগান ? তোমার নয় ? আমাদের মধ্যে এই ভাগ হয়ে গেল কবে থেকে ?"

"যবে থেকে তোমার রইল বিশ্বের আর সমস্ত কিছু আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোণ। আমার এই ভাঙা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ঐ আশ্চর্য্য সরলার সামনে ? আমার সে শক্তি আজ কোথায় যে তোমার সেবা করি, তোমার বাগানের কাজ করি ?"

"নীরু, তুমি তো কতদিন এর আগে আপনি সরলাকে ডেকে পাঠিয়েছ, নিয়েছ ওর পরামর্শ। মনে নেই কি এই কয়েক বছর আগে বাতাবী নেবুর সঙ্গে

কলম্বা লেবুর কলম বেঁধেছ দুইজনে, আমাকে আশ্চর্য্য করে দেবার জন্যে।"

"তখন তো ওর এত গুমোর ছিল না। বিধাতা যে আমারি দিকে আজ অন্ধকার করে দিলে, তাই তো তোমার কাছে হঠাৎ ধরা পড়্ছে, ও এত জানে ও তত জানে, অর্কিড্ চিন্‌তে আমি ওর কাছে লাগিনে। সেদিন তো এসব কথা কোনও দিন শুনিনি। তবে আজ আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে কেন দুজনের তুলনা কর্‌তে এলে? আজ আমি ওর সঙ্গে পার্‌ব কেন? মাপে সমান হব কী নিয়ে?"

"নীরু, আজ তোমার কাছে এই যা সব শুন্‌ছি তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলুম না। মনে হচ্চে এ যেন আমার নীরুর কথা নয়, এ যেন আর কেউ।"

"না গো না সেই নীরুই বটে। তার কথা এতদিনেও তুমি বুঝ্‌লে না। এই আমার সব চেয়ে শাস্তি। বিয়ের পর যেদিন আমি জেনেছিলেম তোমার বাগান তোমার প্রাণের মতো প্রিয়, সেদিন থেকে ঐ বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখিনি একটুকুও। নইলে তোমার বাগানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া বাধ্‌ত, ওকে সইতে পারতুম না। ও হোতো আমার সতীন। তুমি তো

জানো, আমার দিনরাতের সাধনা। জানো কেমন ক'রে ওকে মিলিয়ে নিয়েছি আমার মধ্যে। একেবারে এক হয়ে গেছি ওর সঙ্গে।"

"জানি বই কী। আমার সব কিছুকে নিয়েই যে তুমি।"

"ও সব কথা রাখো। আজ দেখলুম ঐ বাগানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলে আর একজন। কোথাও একটুও ব্যথা লাগ্‌ল না। আমার দেহখানাকে চিরে ফেলবার কথা কি মনে করতেও পারতে, আর কারু প্রাণ তার মধ্যে চালিয়ে দেবার জন্যে! আমার ঐ বাগান কি আমার দেহ নয়? আমি হোলে কি এমন করতে পারতুম?"

"কী করতে তুমি?"

"বল্‌ব কী করতুম? বাগান ছারখার হয়ে যেত হয়তো। ব্যবসা হোতো দেউলে। একটার জায়গায় দশটা মালী রাখতুম কিন্তু আসতে দিতুম না আর কোনো মেয়েকে। বিশেষতঃ এমন কাউকে যার মনে গুমর আছে সে আমার চেয়েও বাগানের কাজ ভালো জানে। ওর এই অহঙ্কার দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করবে প্রতিদিন, যখন আমি আজ মরতে বসেছি,

যখন উপায় নেই নিজের শক্তি প্রমাণ করবার? এমনটা কেন হোতে পারল, বলব?"

"বলো।"

"তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাসো ব'লে। এতদিন সেকথা লুকিয়ে রেখেছিলে।"

আদিত্য কিছুক্ষণ মাথার চুলের মধ্যে হাত গুঁজে বসে রইল। তারপরে বিহ্বলকণ্ঠে বললে—"নীরু, দশ বৎসর তুমি আমাকে জেনেছ, সুখে দুঃখে নানা অবস্থায় নানা কাজে, তারপরেও তুমি যদি এমন কথা আজ বলতে পারো তবে আমি কোনো জবাব করব না। চললুম। কাছে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হবে। ফর্ণারীর পাশে যে জাপানী ঘর আছে সেইখানে থাকব। যখন আমাকে দরকার হবে ডেকে পাঠিয়ো।"

৫

দীঘির ওপারের পাড়িতে চালতা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মতো রাঙা, তার কাঁচাসোনার বরণ ফুল, ঘন গন্ধ ভারি হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াশা যেন। জোনাকীর দল ঝলমল করছে জারুল গাছের ডালে। শান-বাঁধানো ঘাটের বেদীর উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে—সরলা। বাতাস নেই কোথাও, পাতায় নেই কাঁপন, জল যেন কালো ছায়ার ফ্রেমে বাঁধানো পালিস-করা রূপোর আয়না।

পিছনের দিক থেকে প্রশ্ন এল "আস্‌তে পারি কি?"

সরলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, "এসো।" রমেন বস্‌ল ঘাটের সিঁড়ির উপর, পায়ের কাছে। সরলা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে "কোথায় বস্‌লে রমেন দাদা, উপরে এসো।"

রমেন বল্‌লে "জানো দেবীদের বর্ণনা আরম্ভ পদপল্লব

থেকে। পাশে জায়গা থাকে তো পরে বস্‌ব। দাও তোমার হাতখানি, অভ্যর্থনা স্থুরু করি বিলিতি মতে।”

সরলার হাত নিয়ে চুম্বন কর্‌লে। বল্‌লে “সাম্রাজ্ঞীর অভিবাদন গ্রহণ করো।”

তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটুখানি আবির নিয়ে দিলে ওর কপালে মাখিয়ে।

“এ আবার কী?”

“জানো না আজ দোলপূর্ণিমা। তোমাদের গাছে গাছে ডালে ডালে রঙের ছড়াছড়ি। বসন্তে মানুষের গায়ে তো রঙ লাগে না, লাগে তার মনে। সেই রংটাকে বাইরে প্রকাশ করতে হবে, নইলে, বনলক্ষ্মী, অশোকবনে তুমি নির্ব্বাসিত হয়ে থাকবে।”

“তোমার সঙ্গে কথার খেলা করি এমন ওস্তাদি নেই আমার।”

“কথার দরকার কিসের। পুরুষ পাখীই গান করে, তোমরা মেয়ে পাখী চুপ করে শুন্‌লেই উত্তর দেওয়া হোলো। এইবার বস্‌তে দাও পাশে।”

পাশে এসে বস্‌ল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুইজনেই। হঠাৎ সরলা প্রশ্ন করলে “রমেনদা, জেলে যাওয়া যায় কী ক’রে, পরামর্শ দাও আমাকে।”

"জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে কী করে জেলে না যাওয়া যায় সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। এ যুগে গোরার বাঁশি ঘরে টিঁকতে দিল না।"

"না আমি ঠাট্টা করছিনে, অনেক ভেবে দেখলুম আমার মুক্তি ঐখানেই।"

"ভালো করে খুলে বলো তোমার মনের কথাটা।"

"বল্‌ছি সব কথা। সম্পূর্ণ বুঝতে পার্‌তে, যদি আদিৎদার মুখখানা দেখ্‌তে পেতে।"

"আভাসে কিছু দেখেছি।"

"আজ বিকেল বেলায় একলা ছিলেম বারান্দায়। আমেরিকা থেকে ফুলগাছের ছবি-দেওয়া ক্যাটালগ্‌ এসেছে; দেখছিলেম পাতা উল্‌টিয়ে, রোজ বিকেলে সাড়ে চারটার মধ্যে চা খাওয়া সেরে আদিৎদা আমাকে ডেকে নেন বাগানের কাজে। আজ দেখি অন্যমনে বেড়াচ্চেন ঘুরে ঘুরে; মালীরা কাজ করে যাচ্চে তাকিয়েও দেখছেন না। মনে হোলো আমার বারান্দার দিকে আসবেন বুঝি, দ্বিধা করে গেলেন ফিরে। অমন শক্ত লম্বা মানুষ, জোরে চলা, জোরে কাজ, সবদিকেই সজাগ দৃষ্টি, কড়া মনিব অথচ মুখে ক্ষমার হাসি; আজ সেই

মানুষের সেই চলন নেই, দৃষ্টি নেই বাইরে, কোথায় তলিয়ে আছেন মনের ভিতরে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে এলেন কাছে। অন্যদিন হোলে তখনি হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বল্‌তেন, সময় হয়েছে, আমিও উঠে পড়তুম। আজ তা না বলে আস্তে আস্তে পাশে চৌকি টেনে নিয়ে বসলেন। বল্‌লেন ক্যাটালগ্ দেখ্‌ছ বুঝি। আমার হাত থেকে ক্যাটালগ্ নিয়ে পাতা ওল্‌টাতে লাগলেন। কিছু যে দেখলেন তা মনে হোলো না। হঠাৎ একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন, যেন পণ করলেন আর দেরী না করে এখনি কী একটা বলাই চাই। আবার তখনি পাতার দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, "দেখেছ সরি, কত বড়ো ন্যাস্‌টার্শিয়াম্। কণ্ঠে গভীর ক্লান্তি। তারপর অনেকক্ষণ কথা নেই, চল্‌ল পাতা ওল্‌টানো। আর একবার হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাইলেন, চেয়েই ধাঁ ক'রে বই বন্ধ ক'রে আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। আমি বললেম, যাবে না বাগানে? আদিৎদা বললেন, "না ভাই বাইরে বেরোতে হবে, কাজ আছে" বলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলেন।"

"আদিৎদা তোমাকে কী বল্‌তে এসেছিলেন ; কী আন্দাজ করো তুমি।"

"বল্‌তে এসেছিলেন আগেই ভেঙেছে তোমার এক বাগান, এবার হুকুম এল, তোমার কপালে আর এক বাগান ভাঙ্‌বে।"

"তাই যদি ঘটে, সরি, তাহোলে জেলে যাবার স্বাধীনতা যে আমার থাক্‌বে না।"

সরলা ম্লান হেসে বল্‌লে "তোমার সে রাস্তা কি আমি বন্ধ কর্‌তে পারি ? সম্রাটবাহাদুর স্বয়ং খোলাসা রাখবেন।"

"তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝংকার দিতে দিতে চমক লাগিয়ে চল্‌ব জেলখানায়, একি কখনো হোতে পারে ? এখন থেকে তা হোলে যে আমাকে এই বয়সে ভালো মানুষ হোতে শিখতে হবে।"

"কী কর্‌বে তুমি ?"

"তোমার অশুভগ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্টি থেকে তাকে তাড়াব। তারপরে লম্বা ছুটি পাব, এমন কি কালাপানির পার পর্য্যন্ত।"

"তোমার কাছে কোনো কিছুই লুকোতে পারিনে।

একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিছু দিন থেকে। আজ সেটা তোমাকে বল্‌ব, কিছু মনে কোরো না।"

"না বল্‌লে মনে করব।"

"ছেলেবেলা থেকে আদিৎদার সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছি। ভাই বোনের মতো নয়, দুই ভাইএর মতো। নিজের হাতে দুজনে পাশাপাশি মাটি কুপিয়েছি, গাছ কেটেছি। জেঠাইমা আর মা দু তিন দিন পরে পরে মারা যান টাইফয়েডে, আমার বয়স তখন ছয়। বাবার মৃত্যু তার দু'বছর পরে, জেঠামশাইএর মস্ত সাধ ছিল আমিই তাঁর বাগানটিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌ব আমার প্রাণ দিয়ে। তেমনি করেই আমাকে তৈরি করেছিলেন। কাউকে তিনি অবিশ্বাস করতে জানতেন না। যে বন্ধুদের টাকা ধার দিয়েছিলেন তাঁরা শোধ ক'রে বাগানকে দায়মুক্ত করবে এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। শোধ করেছেন কেবল আদিৎদা, আর কেউ না। এই ইতিহাস হয়তো তুমি কিছু কিছু জানো কিন্তু তবু আজ সব কথা গোড়া থেকে বলতে ইচ্ছে করছে।"

"সমস্ত আবার নূতন লাগ্‌ছে আমার।"

"তারপরে জানো হঠাৎ সবই ডুব্‌ল। যখন ডাঙায়

টেনে তুল্‌লে বন্যা থেকে, তখন আর একবার আদিৎদার পাশে এসে ঠেকৃল আমার ভাগ্য। মিললুম তেমনি করেই,—আমরা দুই ভাই, আমরা দুই বন্ধু। তারপর থেকে আদিৎদার আশ্রয়ে আছি এও যেমন সত্যি, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি সেও তেমনি সত্যি। পরিমাণে আমার দিক থেকে কিছু কম হয়নি এ আমি জোর করে বল্‌ব। তাই আমার পক্ষে একটুও কারণ ঘটেনি সঙ্কোচ করবার। এর আগে একত্রে ছিলেম যখন, তখন আমাদের যে বয়স ছিল সেই বয়সটা নিয়েই যেন ফিরলুম, সেই সম্বন্ধ নিয়ে। এমনি করেই চিরদিন চলে যেতে পার্‌ত। আর বলে কী হবে।”

“কথাটা শেষ করে ফেলো।”

“হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েছে। যেদিনকার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছি সেদিনকার আবরণ উড়ে গেছে এক মুহূর্ত্তে। তুমি নিশ্চয় সব জানো রমেনদা, আমার কিছুই ঢাকা থাকে না তোমার চোখে। আমার উপরে বৌদির রাগ দেখে প্রথম প্রথম ভারি আশ্চর্য্য লেগেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারিনি। এতদিন দৃষ্টি পড়েনি নিজের উপর, বৌদিদির বিরাগের আগুনের

আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে। আমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছ কি ?"

"তোমার ছেলেবেলাকার তলিয়ে-থাকা ভালোবাসা নাড়া খেয়ে ভেসে উঠ্‌ছে উপরের তলায়।"

"আমি কী কর্‌ব বলো ? নিজের কাছ থেকে নিজে পালাই কী করে।" বলতে বলতে রমেনের হাত চেপে ধর্‌লে।

রমেন চুপ করে রইল। আবার সে বল্‌লে "যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ বেড়ে চলেছে আমার অন্যায়।"

"অন্যায় কার উপরে ?"

"বৌদির উপরে।"

"দেখো সরলা, আমি মানিনে ওসব পুঁথির কথা। দাবীর হিসেব বিচার করবে কোন্ সত্য দিয়ে? তোমাদের মিলন কত কালের ; তখন কোথায় ছিল বৌদি ?"

"কী বল্‌ছ রমেনদা ! আপন ইচ্ছের দোহাই দিয়ে এ কী আব্‌দারের কথা ? আদিৎদার কথাও তো ভাব্‌তে হবে।"

"হবে বই কী। তুমি কি ভাব্‌ছ, যে-আঘাতে চমকিয়ে দিয়েছে তোমাকে, সেই আঘাতটাই তাঁকে লাগেনি।"

"রমেন নাকি ?" পিছন থেকে শোনা গেল।

"হাঁ দাদা।" রমেন উঠে পড়্‌ল।

"তোমার বৌদি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আয়া এসে এইমাত্র জানিয়ে গেল।"

রমেন চলে গেল, সরলাও তখনি উঠে যাবার উপক্রম করলে।

আদিত্য বল্‌লে "যেয়ো না সরি, একটু বোসো।" আদিত্যের মুখ দেখে সরলার বুক ফেটে যেতে চায়। ঐ অবিশ্রাম কর্ম্মরত আপনা-ভোলা মস্ত মানুষটা এতক্ষণ যেন কেবল পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল হালভাঙা ঢেউখাওয়া নৌকার মতো।

আদিত্য বল্‌লে, "আমরা দুজনে এসংসারে জীবন আরম্ভ করেছিলেম একেবারে এক হয়ে। এত সহজ আমাদের মিল যে এর মধ্যে কোনও ভেদ কোনও কারণে ঘট্‌তে পারে সেকথা মনে করাই অসম্ভব। তাই কি নয় সরি ?"

"অঙ্কুরে যা এক থাকে, বেড়ে উঠে তা ভাগ হয়ে যায় একথা না মেনে তো থাক্‌বার জো নেই আদিৎদা।"

"সে ভাগ তো বাইরে, কেবল চোখে দেখার ভাগ। অন্তরে তো প্রাণের মধ্যে ভাগ হয় না। আজ তোমাকে

আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ধাক্কা এসেছে। আমাকে যে এত বেশি বাজ্‌বে এ আমি কোনোদিন ভাব্‌তেই পারতুম না। সরি, তুমি কি জানো কী ধাক্কাটা এল হঠাৎ আমাদের পরে ?”

“জানি ভাই, তুমি জানবার আগে থাক্‌তেই ?”

“সইতে পার্‌বে সরি ?”

“সইতেই হবে।”

“মেয়েদের সহ্য করবার শক্তি কি আমাদের চেয়ে বেশি, তাই ভাবি।”

“তোমরা পুরুষ মানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই করো, মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য্য, এ ছাড়া আর তো কিছু সম্বল নেই তাদের।”

“তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘট্‌তে দেব না,—দেব না। এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়!”—ব'লে মুঠো শক্ত ক'রে আকাশে কোন্‌ অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই কর্‌তে প্রস্তুত হোলো।

সরলা কোলের উপর আদিত্যের হাতখানা নিয়ে তার উপরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। বলে গেল যেন আপন মনে ধীরে ধীরে,—“ন্যায় অন্যায়ের

কথা নয় ভাই, সম্বন্ধের বন্ধন যখন ফাঁস হয়ে ওঠে তার ব্যথা বাজে নানা লোকের মধ্যে, টানাটানি পড়ে নানাদিক থেকে, কাকেই বা দোষ দেব?”

“তুমি সহ্য করতে পারবে তা জানি। একদিনের কথা মনে পড়ছে। কী চুল ছিল তোমার, এখনো আছে। সেই চুলের গর্ব্ব ছিল তোমার মনে। সবাই সেই গর্ব্বে প্রশ্রয় দিত। একদিন ঝগড়া হোলো তোমার সঙ্গে। দুপুরবেলা বালিশের পরে চুল মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আমি কাঁচি হাতে অন্তত আধহাতখানেক কেটে দিলাম। তখনি জেগে তুমি দাঁড়িয়ে উঠলে, তোমার ঐ কালো চোখ আরো কালো হয়ে উঠল। শুধু বললে—মনে করেছ আমাকে জব্দ করবে? ব'লে আমার হাত থেকে কাঁচি টেনে নিয়ে ঘাড় পর্য্যন্ত চুল কেটে ফেললে কচ্‌কচ্‌ ক'রে। মেসো মশায় তোমাকে দেখে আশ্চর্য্য। বললেন “একী কাণ্ড!” তুমি শান্তমুখে অনায়াসে বললে, “বড়ো গরম লাগে।” তিনিও একটু হেসে সহজেই মেনে নিলেন। প্রশ্ন করলেন না, ভৎর্সনা করলেন না, কেবল কাঁচি নিয়ে সমান করে দিলেন তোমার চুল। তোমারই তো জ্যাঠা মশায়!”

সরলা হেসে বল্‌লে "তোমার যেমন বুদ্ধি! তুমি ভাব্‌ছ এটা আমার ক্ষমার পরিচয়? একটুকুও নয়। সেদিন তুমি আমাকে যতটা জব্দ করেছিলে তার চেয়ে অনেক বেশি জব্দ করেছিলুম আমি তোমাকে। ঠিক কিনা বলো।"

"খুব ঠিক্। সেই কাটা চুল দেখে আমি কেবল কাঁদ্‌তে বাকি রেখেছিলুম। তার পরদিন তোমাকে মুখ দেখাতে পারিনি লজ্জায়। পড়বার ঘরে চুপ করে ছিলেম বসে। তুমি ঘরে ঢুকেই হাত ধ'রে আমাকে হিড়্‌হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে গেলে বাগানের কাজে, যেন কিছুই হয়নি। আরএকদিনের কথা মনে পড়ে, সেই যেদিন ফাল্গুন মাসে অকালে ঝড় উঠে আমার বিছন লাগাবার ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়েছিল তখন তুমি এসে"—

"থাক্ আর বল্‌তে হবে না আদিৎদা" ব'লে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেল্‌লে,—"সে সব দিন আর আসবে না"—বলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়্‌ল।

আদিত্য ব্যাকুল হয়ে সরলার হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "না যেয়ো না, এখনি যেয়ো না, কখন এক সময়ে যাবার দিন আস্‌বে তখন,"—

বল্‌তে বল্‌তে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌ল "কোনো-দিন কেন যেতে হবে! কী অপরাধ ঘটেছে! ঈর্ষ্যা! আজ দশবৎসর সংসারযাত্রায় আমার পরীক্ষা হোলো তারি এই পরিণাম! কী নিয়ে ঈর্ষ্যা? তাহোলে তো তেইশ বছরের ইতিহাস মুছে ফেল্‌তে হয়, যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেখা?"

"তেইশ বছরের কথা বল্‌তে পারিনে ভাই, কিন্তু তেইশ বছরের এই শেষ বেলাতে ঈর্ষ্যার কি কোনও কারণই ঘটেনি? সত্যি কথা তো বল্‌তে হবে। নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী? তোমার আমার মধ্যে কোনও কথা যেন অস্পষ্ট না থাকে।"

আদিত্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বলে উঠ্‌ল "অস্পষ্ট আর রইল না। অন্তরে অন্তরে বুঝেছি তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তোমাকে জীবনের প্রথম বেলায়, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না।"

"কথা বোলো না আদিৎদা, দুঃখ আর বাড়িয়ো না। একটু স্থির হয়ে দাও ভাব্‌তে।"

"ভাবনা নিয়ে তো পিছনের দিকে যাওয়া যায় না। দুজনে যখন জীবন আরম্ভ করেছিলেম মেসোমশাইএর

কোলের কাছে, সে তো না ভেবে চিন্তে। আজ কোনও রকমের নিড়নি দিয়ে কি উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে পার্‌বে সেই আমাদের দিনগুলিকে ? তোমার কথা বল্‌তে পারি নে, সরি, আমার তো সাধ্য নেই।"

"পায়ে পড়ি, দুর্ব্বল কোরো না আমাকে। দুর্গম কোরো না উদ্ধারের পথ।"

আদিত্য সরলার হাত চেপে ধরে বল্‌লে—"উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখ্‌ব না, ভালোবাসি তোমাকে। একথা আজ এত সহজ ক'রে সত্য ক'রে বল্‌তে পার্‌ছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় ফুটে উঠেছে। আমি বল্‌ছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম্ম।"

"চুপ চুপ, আর বোলো না। আজকের রাত্তিরের মতো মাপ করো, মাপ করো আমাকে।"

"সরি, আমিই কৃপাপাত্র, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমিই তোমার ক্ষমার যোগ্য। কেন আমি ছিলুম অন্ধ ? কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল ক'রে ? তুমি তো করোনি, কত পাত্র এসেছিল তোমাকে কামনা ক'রে, সে তো আমি জানি।"

"জ্যাঠা মশায় যে আমাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাঁর বাগানের কাজে, নইলে হয় তো—"

"না না—তোমার মনের গভীরে ছিল তোমার সত্য উজ্জ্বল। না জেনেও তার কাছে তুমি বাঁধা রেখেছিলে নিজেকে। আমাকে কেন তুমি চেতন ক'রে দাওনি? আমাদের পথ কেন হোলো আলাদা?"

"থাক্, থাক্, যাকে মেনে নিতেই হবে তাকে না মানবার জন্য ঝগড়া কর্‌ছ কার সঙ্গে? কী হবে মিথ্যে ছট্‌ফট্ ক'রে? কাল দিনের বেলায় যা হয় একটা উপায় স্থির করা যাবে।"

"আচ্ছা, চুপ করলুম। কিন্তু এমন জ্যোৎস্না রাত্রে আমার হয়ে কথা কইবে এমন কিছু রেখে যাব তোমার কাছে।"

বাগানে কাজ করবার জন্য আদিত্যের কোমরে একটা ঝুলি থাকে বাঁধা, কিছু-না-কিছু সংগ্রহ করবার দরকার হয়। সেই ঝুলি থেকে বের কর্‌লে ছোটো তোড়ায় বাঁধা পাঁচটি নাগকেশরের ফুল। বল্‌লে, "আমি জানি নাগকেশর তুমি ভালোবাসো। তোমার কাঁধের ঐ আঁচলের উপর পরিয়ে দেব? এই এনেছি সেফ্‌টিপিন্।"

সরলা আপত্তি করলে না। আদিত্য বেশ একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিলে। সরলা উঠে দাঁড়াল, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে, দুই হাত ধরে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেমন তাকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ। বল্‌লে, "কী আশ্চর্য্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য্য!"

সরলা হাত ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আদিত্য অনুসরণ করলে না, যতক্ষণ দেখা যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে। তারপরে বসে পড়্‌ল সেই ঘাটের বেদীর পরে। চাকর এসে খবর দিল "খাবার এসেছে"। আদিত্য বল্‌ল "আজ আমি খাব না।"

———

৬

রমেন দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলে "বৌদি ডেকেছ কি?" নীরজা রুদ্ধ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে উত্তর দিলে, "এসো।"

ঘরের সব আলো নেবানো। জানলা খোলা, জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়, পড়েছে নীরজার মুখে, আর শিয়রের কাছে আদিত্যের দেওয়া সেই ল্যাবার্নম্ গুচ্ছের উপর। বাকী সমস্ত অস্পষ্ট। বালিশে হেলান দিয়ে নীরজা অর্দ্ধেক উঠে বসে আছে, চেয়ে আছে জানলার বাইরে। সেদিকে অর্কিডের ঘর পেরিয়ে দেখা যাচ্চে সুপারি গাছের সার। এইমাত্র হাওয়া জেগেছে, দুলে উঠ্ছে পাতাগুলো, গন্ধ আস্ছে আমের বোলের। অনেক দূর থেকে শব্দ শোনা যায় মাদলের আর গানের, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের বস্তিতে হোলি জমেছে। মেঝের উপর পড়ে আছে মালাই বরফি আর কিছু আবির। দারোয়ান দিয়ে গেছে উপহার।

রোগীর বিশ্রামভঙ্গের ভয়ে সমস্ত বাড়ি আজ নিস্তব্ধ। এক গাছ থেকে আর এক গাছে 'পিয়ুকাঁহা' পাখীর চলেছে উত্তর প্রত্যুত্তর, কেউ হার মান্‌তে চায় না। রমেন মোড়া টেনে এনে বস্‌ল বিছানার পাশে। পাছে কান্না ভেঙে পড়ে এই ভয়ে অনেকক্ষণ নীরজা কোনও কথা বল্‌লে না। তার ঠোঁট কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, গলার কাছটাতে যেন বেদনার ঝড় পাক্ খেয়ে উঠ্‌ছে। কিছু পরে সাম্‌লে নিলে, ল্যাবার্নম্ গুচ্ছের ছুটো খসে-পড়া ফুল দলিত হয়ে গেল তার মুঠোর মধ্যে। তার পরে কোনো কথা না ব'লে একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। চিঠিখানা আদিত্যের লেখা। তাতে আছে—

"এতদিনের পরিচয়ের পরে আজ হঠাৎ দেখা গেল আমার নিষ্ঠায় সন্দেহ করা সম্ভবপর হোলো তোমার পক্ষে। এ নিয়ে যুক্তি তর্ক কর্‌তে লজ্জা বোধ করি। তোমার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় আমার সকল কথা সকল কাজই বিপরীত হবে তোমার অনুভবে। সেই অকারণ পীড়ন তোমার দুর্ব্বল শরীরকে আঘাত কর্‌বে প্রতি মুহূর্ত্তে। আমার পক্ষে দূরে থাকাই ভালো, যে পর্য্যন্ত না তোমার মন সুস্থ হয়। এও বুঝ্‌লুম, সরলাকে এখানকার কাজ থেকে বিদায় করে দিই,

এই তোমার ইচ্ছা। হয়তো দিতে হবে। ভেবে দেখ্‌লুম তা ছাড়া অন্য পথ নেই। তবু বলে রাখি, আমাব শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি সমস্তই সরলার জ্যাঠা-মশায়ের প্রসাদে; আমার জীবনে সার্থকতার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তাঁরই স্নেহেব ধন সরলা সর্ব্বস্বান্ত নিঃসহায়। আজ ওকে যদি ভাসিয়ে দিই তো অধর্ম্ম হবে। তোমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেও পার্‌ব না।

অনেক ভেবে স্থিব করেছি, আমাদের ব্যবসায়ে নতুন বিভাগ একটা খুল্‌ব, ফল সব্‌জির বীজ তৈরির বিভাগ। মাণিকতলায় বাড়িসুদ্ধ জমি পাওয়া যেতে পার্‌বে। সেইখানেই সরলাকে বসিয়ে দেব কাজে। এই কাজ আরম্ভ করবার মতো নগদ টাকা হাতে নেই আমার। আমাদের এই বাগানবাড়ি বন্ধক রেখে টাকা তুল্‌তে হবে। এ প্রস্তাবে রাগ কোরো না এই আমার একান্ত অনুরোধ। মনে রেখো, সরলার জ্যাঠামশায় আমার এই বাগানের জন্যে আমাকে মূলধন বিনাসুদে ধার দিয়েছিলেন, শুনেছি তারও কিছু অংশ তাঁকে ধার কর্‌তে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাজ সুরু করে দেবার মতো বীজ, কলমের গাছ, দুর্লভ

ফুলগাছের চারা, অর্কিড্, ঘাসকাটা কল ও অন্যান্য অনেক যন্ত্র দান করেছেন বিনামূল্যে। এত বড়ো সুযোগ যদি আমাকে না দিতেন, আজ ত্রিশটাকা বাসাভাড়ায় কেরাণীগিরি কর্‌তে হোতো, তোমার সঙ্গে বিবাহও ঘট্‌ত না কপালে। তোমার সঙ্গে কথা হবার পর এই প্রশ্নই বার বার মনে আমার উঠেছে, আমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছি, না আমাকেই আশ্রয় দিয়েছে সরলা? এই সহজ কথাটাই ভুলেছিলেম, তুমিই আমাকে দিলে মনে করিয়ে। এখন তোমাকেও মনে রাখ্‌তে হবে। কখনো ভেবো না সরলা আমার গলগ্রহ। ওদের ঋণ শোধ কর্‌তে পার্‌ব না কোনোদিন, ওর দাবীরও অন্ত থাক্‌বে না আমার 'পরে। তোমার সঙ্গে কখনো যাতে ওর দেখা না হয় সে চেষ্টা রইল মনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয় সেকথা আজ যেমন বুঝেছি এমন এর আগে কখনো বুঝিনি। সব কথা বল্‌তে পারলুম না, আমার দুঃখ আজ কথার অতীত হয়ে গেছে। যদি অনুমানে বুঝ্‌তে পারো তো পার্‌লে, নইলে জীবনে এই প্রথম আমার বেদনা, যা রইল তোমার কাছে অব্যক্ত।”—

রমেন চিঠিখানা পড়্‌লে দুইবার। পড়ে চুপ করে রইল।

নীরজা ব্যাকুলস্বরে বল্‌লে "কিছু একটা বলো ঠাকুরপো।"

রমেন তবু কিছু উত্তর দিলে না।

নীরজা তখন বিছানার উপর লুটিয়ে প'ড়ে বালিশে মাথা ঠুক্‌তে লাগ্‌ল, বল্‌লে, "অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু কেউ কি তোমরা বুঝ্‌তে পারো না কিসে আমার মাথা দিল খারাপ ক'রে?"

"কী করছ বৌদি? শান্ত হও, তোমার শরীর যে যাবে ভেঙে।"

"এই ভাঙা শরীরই তো আমার কপাল ভেঙেছে, ওর জন্য মমতা কিসের? তাঁর 'পরে আমার অবিশ্বাস—এ দেখা দিল কোথা থেকে? এ যে অক্ষম জীবন নিয়ে আমার নিজেরই উপরে অবিশ্বাস। সেই তাঁর নীরু আজ আছে কোথায়, যাকে তিনি কখনো বল্‌তেন 'মালিনী', কখনো বল্‌তেন 'বনলক্ষ্মী'! আজ কে নিলে কেড়ে তার উপবন? আমার কি একটাই নাম ছিল? কাজ সেরে আস্‌তে যেদিন তাঁর দেরী হোতো আমি বসে থাক্‌তুম তাঁর খাবার আগ্‌লে,

তখন আমাকে ডেকেছেন 'অন্নপূর্ণা'। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বস্‌তেন দীঘির ঘাটে, ছোটো রূপোর থালায় বেলফুল রাশ ক'রে তার উপরে পান সাজিয়ে দিতেম তাঁকে, হেসে আমাকে বল্‌তেন, 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী'। সেদিন সংসারের সব পরামর্শই আমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। আমাকে নাম দিয়েছিলেন 'গৃহসচিব', কখনো বা 'হোম্ সেক্রেটারি'। আমি যেন সমুদ্রে এসেছিলেম ভরা নদী, ছড়িয়েছিলেম নানা শাখা নানা দিকে, সব শাখাতেই আজ একদণ্ডে জল গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে পড়্‌ল পাথর।"

"বৌদি আবার তুমি সেরে উঠ্‌বে—তোমার আসন আবার অধিকার করবে পূর্ণশক্তি দিয়ে।"

"মিছে আশা দিয়ো না ঠাকুরপো। ডাক্তার কী বলে সে আমার কানে আসে। সেইজন্যেই এতদিনের সুখের সংসারকে এত ক'রে আক্‌ড়ে ধরতে আমার এই নৈরাশ্যের কাঙালপনা।"

"দরকার কী বৌদি? আপনাকে এতদিন তো ঢেলে দিয়েছ তোমার সংসারে। তার চেয়ে বড়ো কথা আর কিছু আছে কি? যেমন দিয়েছ তেমনি পেয়েছ, এত পাওয়াই বা কোন্ মেয়ে পায়? যদি ডাক্তারের কথা

সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তাহোলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও। এতদিন যে গৌরবে কাটিয়েছ সে গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন? এ বাড়িতে তোমার শেষ স্মৃতিকে যাবার সময় নূতন মহিমা দিয়ো।”

“বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো, বুক ফেটে যায়। আমার এতদিনের আনন্দকে ফেলে রেখে হাসিমুখেই চলে যেতে পারতুম। কিন্তু কোনওখানে কি এতটুকু ফাঁক থাক্‌বে না যেখানে আমার জন্যে একটা বিরহের দীপ টিম্‌টিম্‌ করেও জ্বল্‌বে? একথা ভাব্‌তে গেলে যে মর্‌তেও ইচ্ছে করে না। ঐ সরলা সমস্তটাই দখল কর্‌বে একেবারে পুরোপুরি, বিধাতার এই কি বিচার?”

“সত্যি কথা বল্‌ব বৌদি, রাগ কোরো না। তোমার কথা ভালো বুঝ্‌তেই পারিনে। যা নিজে ভোগ কর্‌তে পার্‌বে না, তাও প্রসন্ন মনে দান কর্‌তে পারো না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? তোমার ভালোবাসার উপর এত বড়ো খোঁটা থেকে যাবে? তোমার সংসারে তোমারই শ্রদ্ধার প্রদীপ তুমি আপনিই আজ চুরমার করতে বসেছ! তার ব্যথা তুমি চলে যাবে এড়িয়ে, কিন্তু চিরদিন সে আমাদের বাজ্‌বে যে। মিনতি করে বল্‌ছি তোমার

সারা জীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষ মুহূর্তে কৃপণ করে যেয়ো না।”

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল নীরজা। চুপ করে বসে রইল রমেন, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা মাত্র করলে না, কান্নার বেগ থেমে গেলে নীরজা বিছানায় উঠে বস্‌ল। বল্‌লে “আমার একটি ভিক্ষা আছে ঠাকুরপো।”

“হুকুম করো বৌদি।”

“বলি শোনো। যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ঐ পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন বিশ্রী ছোটো। যেমন করে পারো আমাকে গুরুর সন্ধান দাও। না হোলে কাট্‌বে না বন্ধন। আসক্তিতে জড়িয়ে পড়্‌ব। যে সংসারে সুখের জীবন কাটিয়েছি, মরার পরে সেইখানেই দুঃখের হাওয়ায় যুগযুগান্তর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে; তার থেকে উদ্ধার করো আমাকে, উদ্ধার করো।”

“তুমি তো জানো বৌদি শাস্ত্রে যাকে বলে পাষণ্ড, আমি তাই। কিছু মানিনে। প্রভাস মিত্তির অনেক টানাটানি ক’রে একবার আমাকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পড়বার আগে

দিলেম দৌড়। জেলখানার মেয়াদ আছে, এ বাঁধন বেমেয়াদি।”

“ঠাকুরপো তোমার মন জোরালো, তুমি কিছুতে বুঝ্‌বে না আমার বিপদ। বেশ জানি যতই আঁকুবাঁকু কর্‌ছি ততই ডুব্‌ছি অগাধ জলে, সাম্‌লাতে পার্‌ছিনে।”

“বৌদি, একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে কর্‌বে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্চে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বল্‌বে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার,—‘দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্ম্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি’,—সব ভার যাবে এক মুহূর্ত্তে নেমে। মন ভরে উঠ্‌বে আনন্দে। গুরুকে দরকার নেই: এখনি বলো,—দিলেম, দিলেম, কিছুই হাতে রাখলেম না, আমার সব কিছু দিলেম, নির্ম্মুক্ত হয়ে নির্ম্মল হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে।”

“আহা, বলো, বলো ঠাকুরপো, বার বার করে শোনাও আমাকে। তাঁকে এ পর্য্যন্ত যা কিছু দিতে পেরেছি তাতেই পেয়েছি আনন্দ, আজ যা দিতে পার্‌ছিনে, তাতেই এত করে মার্‌ছে। দেবো, দেবো,

দেবো সব দেবো আমার,—আর দেরি নয়, এখনি। তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।”

“আজ নয় বৌদি, কিছুদিন ধরে মনটাকে বেঁধে নাও, সহজ হোক্ তোমার সঙ্কল্প।”

“না, না, আর সইতে পারছিনে। যখন থেকে বলে গেছেন এ বাড়ি ছেড়ে জাপানী ঘরে গিয়ে থাক্‌বেন তখন থেকে এ শয্যা আমার কাছে চিতাশয্যা হয়ে উঠেছে। যদি ফিরে না আসেন এ রাত্তির কাট্‌বে না, বুক ফেটে মরে যাব। অমনি ডেকে এনো সরলাকে, আমি শেল উপ্‌ড়ে ফেল্‌ব বুকের থেকে, ভয় পা'ব না, এই তোমাকে বল্‌ছি নিশ্চয় করে।”

“সময় হয়নি, বৌদি ; আজ থাক্।”

“সময় যায় পাছে এই ভয়। এক্ষণি ডেকে আনো।” পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দুহাত জোড় করে বল্‌লে, “বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পূজা অর্চ্চনা সব গেল আমার। ঠাকুরপো একটা কথা বলি, আপত্তি কোরো না।”

“কী বলো।”

"একবার আমাকে ঠাকুরঘরে যেতে দাও দশ মিনিটের জন্যে, তাহোলে আমি বল পাব কোনও ভয় থাক্‌বে না।"

"আচ্ছা, যাও, আপত্তি কর্‌ব না।"

"আয়া।"

"কী খোঁখী।"

"ঠাকুর ঘরে নিয়ে চল্‌ আমাকে।"

"সে কী কথা। ডাক্তারবাবু—"

"ডাক্তারবাবু যমকে ঠেকাতে পার্‌বে না আর আমার ঠাকুরকে ঠেকাবে?"

"আয়া তুমি ওঁকে নিয়ে যাও ভয় নেই, ভালোই হবে।"

আয়াকে অবলম্বন ক'রে নীরজা যখন চলে গেল এমন সময় আদিত্য ঘরে এল।

আদিত্য জিজ্ঞাসা কর্‌লে "এ কী, নীরু ঘরে নেই কেন?"

"এখনি আস্‌বেন, তিনি ঠাকুর ঘরে গেছেন।"

"ঠাকুর ঘরে? ঘর তো কাছে নয়। ডাক্তারের নিষেধ আছে যে।"

"শুনো না দাদা। ডাক্তারের ওষুধের চেয়ে কাজে

লাগ্‌বে। একবার কেবল ফুলের অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করেই চলে আস্‌বেন।”

নীরজাকে চিঠি লিখে যখন পাঠিয়ে দিয়েছিল তখন আদিত্য স্পষ্ট জান্‌ত না যে অদৃষ্ট তার জীবনের পটে প্রথম যে লিপিখানি অদৃশ্য কালিতে লিখে রেখেছে, বাইরের তাপ লেগে সেটা হঠাৎ এতখানি উঠ্‌বে উজ্জ্বল হয়ে। প্রথমে ও সরলাকে বল্‌তে এসেছিল—আর উপায় নেই, ছাড়াছাড়ি কর্‌তে হবে। সেই কথা বল্‌বার বেলাতেই ওর মুখ দিয়ে বেরোলো উল্টো কথা। তারপরে জ্যোৎস্না রাত্রে ঘাটে বসে বসে, বারবার করে বলেছে, জীবনের সত্যকে আবিষ্কার করেছে বিলম্বে, তাই বলেই তাকে অস্বীকার কর্‌তে পারে না। ওর তো অপরাধ নেই, লজ্জা কর্‌বার নেই কিছু। অন্যায় তবেই হবে, যদি সত্যকে গোপন কর্‌তে যায়। কর্‌বে না গোপন, নিশ্চয় স্থির ; ফলাফল যা হয় তা হোক্। এ কথা আদিত্য বেশ বুঝেছে যে, যদি তার জীবনের কেন্দ্র থেকে কর্ম্মের ক্ষেত্র থেকে সরলাকে আজ সরিয়ে দেয়, তবে সেই একাকিকতায়, সেই নীরসতায় ওর সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে, ওব কাজ পর্য্যন্ত যাবে বন্ধ হয়ে।

“রমেন,তুমি আমাদের সব কথা জানো,আমি জানি।”

"হাঁ জানি।"

"আজ চুকিয়ে দেবো সব,আজ পরদা ফেল্‌ব উঠিয়ে।"

"তুমি তো একলা নও দাদা। বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেল্‌লেই তো হোলো না। বৌদি রয়েছেন ওদিকে। সংসারের গ্রন্থি জটিল।"

"তোমার বৌদির আর আমার মধ্যে মিথ্যাকে খাড়া করে রাখ্‌তে পার্‌ব না। বাল্যকাল থেকে সরলার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই সে কথা মানো তো?"

"মানি বই কি।"

"সেই সহজ সম্বন্ধের তলায় গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল, জান্‌তে পারিনি, সে কি আমাদের দোষ?"

"কে বলে দোষ?"

"আজ সেই কথাটাই যদি গোপন করি তাহোলেই মিথ্যাচরণের অপরাধ হবে। আমি মুখ তুলেই বল্‌ব।"

"গোপনই বা কর্‌তে যাবে কী জন্যে, আর সমারোহ করে প্রকাশই বা কর্‌বে কেন? বৌদিদির যা জান্‌বার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর ক'টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি কোরো না। বৌদি যা

বল্‌তে চান শোনো, তার উত্তরে তোমারো যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।"

নীরজাকে ঘরে আস্‌তে দেখে রমেন বেরিয়ে গেল।

নীরজা ঘরে ঢুকেই আদিত্যকে দেখেই মেঝের উপরে লুটিয়ে প'ড়ে পায়ে মাথা রেখে অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বল্‌লে "মাপ করো, মাপ করো আমাকে, অপরাধ করেছি। এত দিন পরে ত্যাগ কোরো না আমাকে, দূরে ফেলো না আমাকে।" আদিত্য দুই হাতে তাকে তুলে ধরে বুকে করে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বল্‌লে, "নীরু, তোমার ব্যথা কি আমি বুঝিনে।" নীরজার কান্না থাম্‌তে চায় না। আদিত্য আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। নীরজা আদিত্যের হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধর্‌লে, বল্‌লে, "সত্যি বলো আমাকে মাপ করেছ। তুমি প্রসন্ন না হোলে মরার পরেও আমার সুখ থাক্‌বে না।"

"তুমি তো জানো নীরু, মাঝে মাঝে মনান্তর হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু মনের মিল কি ভেঙেছে তা নিয়ে ?"

"এর আগে তো কোনো দিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাওনি তুমি। এবারে গেলে কেন ? এত নিষ্ঠুর তোমাকে করেছে কিসে ?"

"অন্যায় করেছি নীরু মাপ করতে হবে।"

"কী বলো তার ঠিক নেই। তোমার কাছ থেকেই আমার সব শাস্তি, সব পুরস্কার। অভিমানে তোমার বিচার করতে গিয়েই তো আমার এমন দশা ঘটেছিল। —ঠাকুরপোকে বলেছিলুম, সরলাকে ডেকে আন্‌তে, এখনো আন্‌লেন না কেন?"

সরলাকে ডেকে আন্‌বার কথায় ধক্ করে ঘা লাগ্‌ল আদিত্যের মনে। সমস্যাকে অন্তত আজকের মতো কোনো ক্রমে সরিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে সে নিশ্চিন্ত হয়। বল্‌লে, "রাত হয়েছে এখন থাক্।" এমন সময় নীরজা বলে উঠ্‌ল, "ঐ শোনো আমার মনে হচ্চে ওরা অপেক্ষা করছে দরজার বাইরে। ঠাকুরপো ঘরে এসো তোমরা।"

সরলাকে নিয়ে রমেন ঘরে ঢুক্‌ল। নীরজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সরলা প্রণাম কর্‌লে নীরজার পা ছুঁয়ে। নীরজা বল্‌লে "এসো বোন আমার কাছে এসো।"

সরলার হাত ধরে বিছানায় বসালো। বালিশের নীচে থেকে গয়নার কেস টেনে নিয়ে একটি মুক্তোর মালা বের করে সরলাকে পরিয়ে দিলে। বল্‌লে "একদিন ইচ্ছে করেছিলুম, যখন চিতায় আমার দাহ হবে এই

মালাটি যেন আমার গলায় থাকে। কিন্তু তার চেয়ে এই ভালো। আমার হয়ে মালা তুমিই গলায় প'রে থাকো, শেষ দিন পর্য্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতবার পরেছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাক্‌লে সেই দিনগুলি ওঁর মনে পড়্‌বে।"

"অযোগ্য, আমি দিদি, অযোগ্য, কেন আমাকে লজ্জা দিচ্চ।"

নীরজা মনে করেছিল, আজ তার সর্ব্বদানযজ্ঞের এও একটা অঙ্গ। কিন্তু তার অন্তরতর মনের জ্বালা যে এই দানের মধ্যে দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেল সে কথা নিজেও স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারেনি। ব্যাপারটা সরলাকে যে কতখানি বাজ্‌ল তা অনুভব কর্‌লে আদিত্য। বল্‌লে "ঐ মালাটা আমাকে দাও না সরলা। ওর মূল্য আমার কাছে যতখানি, এমন আর কারো কাছে নয়। ও আমি আর কাউকে দিতে পার্‌ব না।" নীরজা বল্‌লে "আমার কপাল। এত করেও বোঝাতে পার্‌লুম না বুঝি। সরলা, শুনেছিলেম এই বাগান থেকে তোমার চলে যাবার কথা হয়েছিল। সে আমি কোনো মতেই ঘট্‌তে দেবো না। তোমাকে আমি আমার সংসারের যা-কিছু সমস্তর সঙ্গে রাখ্‌ব বেঁধে, ঐ হারটি তারই চিহ্ন। এই আমার বাঁধন

তোমার হাতে দিয়েছিলুম যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে মর্‌তে পারি।”

“ভুল কর্‌ছ দিদি,আমাকে বাঁধ্‌তে চেয়ো না, ভালো হবে না তাতে।”

“সে কী কথা?”

“আমি সত্যি কথাই বল্‌ব। এতদিন আমাকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তে। কিন্তু আজ আমাকে বিশ্বাস কোরো না, এই আমি তোমাদের সকলের সামনে বল্‌ছি। ভাগ্য যে দান থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে, কাউকে বঞ্চনা করে সে আমি নেব না। এই রইল তোমার পায়ে আমার প্রণাম। আমি চল্‌লেম। অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দুবেলা পূজা করেছি। সেও আজ আমার শেষ হোলো।”

এই বলে সরলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আদিত্য নিজেকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌ল না, সেও গেল চলে।

“ঠাকুরপো, এ কী হোলো ঠাকুরপো। বলো ঠাকুরপো একটা কথা কও।”

“এই জন্যেই বলেছিলেম আজ রাত্রে ডেকো না।”

"কেন মন খুলে আমি তো সবই দিয়েছি। ও কি তাও বুঝ্‌ল না?"

"বুঝেছে বই কি। বুঝেছে যে মন তোমার খোলে নি। সুর বাজ্‌ল না।"

"কিছুতে বিশুদ্ধ হোলো না আমার মন। এত মার খেয়েও! কে বিশুদ্ধ করে দেবে? ওগো সন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও না। ঠাকুরপো, কে আমার আছে কার কাছে যাব আমি?"

"আমি আছি বৌদি। তোমার দায় আমি নেব। তুমি এখন ঘুমোও।"

"ঘুমোব কেমন ক'রে? এ বাড়ি থেকে আবার যদি উনি চলে যান তাহোলে মরণ নইলে আমার ঘুম হবে না।"

"চলে উনি যেতে পারবেন না; সে ওঁর ইচ্ছায় নেই, শক্তিতে নেই। এই নাও ঘুমের ওষুধ, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি যাব।"

"যাও ঠাকুরপো তোমরা যাও, ওরা দুজনে কোথায় গেল দেখে এসো, নইলে আমি নিজেই যাব, তাতে আমার শরীর ভাঙে ভাঙুক্।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।"

৭

আদিত্য ওর সঙ্গে এল দেখে সরলা বল্‌লে, "কেন এলে ? ভালো করোনি। ফিরে যাও। আমার সঙ্গে তোমাকে এমন করে দেবো না জড়াতে।"

"তুমি দেবে কি না সে তো কথা নয়, জড়িয়ে যে গেছেই। সেটা ভালো হোক্ বা মন্দ হোক্ তাতে আমাদের হাত নেই।"

"সে সব কথা পরে হবে, ফিরে যাও রোগীকে শান্ত করো গে।"

"আমাদের সেই বাগানের আর একটা শাখা বাড়্‌বে সেই কথাটা—"

"আজ থাক্। আমাকে দু-চার দিন ভাব্‌বার সময় দাও, এখন আমার ভাব্‌বার শক্তি নেই।"

রমেন এসে বল্‌লে, "যাও, দাদা, বৌদিকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও গে, দেরি কোরো না। কিছুতেই কোনো কথা কইতে দিয়ো না ওঁকে। রাত হয়ে গেছে।"

আদিত্য চলে গেলে পর সরলা বল্‌লে—"শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কাল তোমাদের একটা সভা আছে না ?"

"আছে।"

"তুমি যাবে না?"

"যাবার কথা ছিল। কিন্তু এবার আর যাওয়া হোলো না।"

"কেন?"

"সে কথা তোমাকে ব'লে কী হবে?"

"তোমাকে ভীতু ব'লে সবাই নিন্দে করবে।"

"যারা আমায় পছন্দ করে না তারা আমায় নিন্দে করবে বই কি।"

"তাহোলে শোনো আমার কথা, আমি তোমাকে মুক্তি দেবো। সভায় তোমাকে যেতেই হবে।"

"আর একটু স্পষ্ট করে বলো।"

"আমিও যাব, সভায় নিশেন হাতে নিয়ে।"

"বুঝেছি।"

"পুলিসে বাধা দেয় সেটা মানতে রাজি আছি কিন্তু তুমি বাধা দিলে মানব না।"

"আচ্ছা বাধা দেবো না।"

"এই রইল কথা।"

"রইল।"

"আমরা দুজন একসঙ্গে যাব কাল বিকেল পাঁচটার সময়।"

"হাঁ যাব, কিন্তু ঐ দুর্জ্জনরা তারপরে আমাদের আর এক সঙ্গে থাক্‌তে দেবে না।"

এমন সময় আদিত্য এসে পড়্‌ল। সরলা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ওকী, এখনি এলে যে বড়ো?"

"তুই একটা কথা বল্‌তে বলতেই নীরজা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ল, আমি আস্তে আস্তে চলে এলুম।"

রমেন বল্‌লে "আমার কাজ আছে চল্‌লুম।" সরলা হেসে বল্‌লে, "বাসা ঠিক করে রেখো ভুলো না।"

"কোনো ভয় নেই। চেনা জায়গা।" এই বলে সে চলে গেল।

৮

সরলা বসেছিল, সে উঠে দাঁড়াল, বললে, "যে সব কথা বল্‌বার নয় সে আমাকে বোলো না আজ, পায়ে পড়ি।"

"কিছু বল্‌ব না ভয় নেই।"

"আচ্ছা তাহোলে আমিই কিছু বল্‌তে চাই শোনো, বলো কথা রাখ্‌বে।"

"অরক্ষণীয় না হোলে কথা নিশ্চয় রাখ্‌ব তুমি তা জানো।"

"বুঝ্‌তে বাকী নেই আমি কাছে থাক্‌লে একেবারেই চল্‌বে না। এই সময়ে দিদির সেবা কর্‌তে পার্‌লে খুসী হতুম, কিন্তু সে আমার ভাগ্যে সইবে না। আমাকে অনুপস্থিত থাক্‌তেই হবে। একটু থামো, কথাটা শেষ কর্‌তে দাও। শুনেইছ ডাক্তার বলেছেন বেশি দিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপ্‌ড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়্‌তে দিয়ো না ওঁর জীবনে।"

"আমার মন থেকে আপনিই ছায়া যদি পড়ে, তবে কী করতে পারি।"

"না না নিজের সম্বন্ধে অমন অশ্রদ্ধার কথা বোলো না। সাধারণ বাঙালী ছেলের মতো ভিজে মাটির তল্‌তলে মন কি তোমার? কক্ষণো না, আমি তোমাকে জানি।"

আদিত্যের হাত ধরে বল্‌লে, "আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ ক'টা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ক'রে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে আমি এসেছিলেম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্যে।"

আদিত্য চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কথা দাও ভাই।"

"দেবো কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। বলো, রাখ্‌বে।"

"তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ এই যে, আমি যদি তোমাকে কিছু প্রতিজ্ঞা করাই সেটা সাধ্য, কিন্তু তুমি যদি করাও সেটা হয়তো অসম্ভব হবে।"

"না হবে না।"

"আচ্ছা বলো।"

"যে কথা মনে মনে বলি সে কথা তোমার কাছে মুখে বল্‌তে অপরাধ নেই! তুমি যা বল্‌ছ তা নেব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ কর্‌বে আমার সমস্ত শূন্যতা। কেন চুপ করে রইলে?"

"জানিনে যে ভাই প্রতিজ্ঞা পালনে কী বিঘ্ন একদিন ঘট্‌তে পারে।"

"বিঘ্ন তোমার অন্তরে আছে কি? সেই কথাটা বলো আগে।"

"কেন আমাকে দুঃখ দাও? তুমি কি জানো না এমন কথা আছে ভাষায় বল্‌লে যার আলো যায় নিভে।"

"আচ্ছা এই শুন্‌লুম, এই শুনেই চল্‌লুম কাজে।"

"আর ফিরে তাকাবে না এখন?"

"না, কিন্তু অব্যক্ত প্রতিজ্ঞার শিলমোহর করে নিতে ইচ্ছা কর্‌ছে তোমার মুখটিতে।"

"যা সহজ তাকে নিয়ে জোর কোরো না। থাক্ এখন।"

"আচ্ছা, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখন কী কর্‌বে, থাক্‌বে কোথায়?"

"সে ভার নিয়েছেন রমেনদা।"

"রমেন তোমাকে আশ্রয় দেবে? সে লক্ষ্মীছাড়ার চালচুলো আছে কি?"

"ভয় নেই তোমার, পাকা আশ্রয় তাঁর নিজের সম্পত্তি নয়, কিন্তু বাধা ঘটবে না।"

"আমি জান্‌তে পার্‌ব তো?"

"নিশ্চয় জান্‌তে পার্‌বে কথা দিয়ে যাচ্চি; কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে দেখবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হোতে পার্‌বে না এই সত্য করো।"

"তোমারো মন ব্যস্ত হবে না?"

"যদি হয় অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জান্‌তে পার্‌বে না।"

"আচ্ছা, কিন্তু যাবার সময় ভিক্ষার পাত্র একেবারে শূন্য রেখেই বিদায় দেবে?"

পুরুষের চোখ ছল ছল করে উঠ্‌ল। সরলা কাছে এসে নীরবে মুখ তুলে ধর্‌লে।

৯

"বোশ্‌নি।"

"কী খোঁখি ?"

"কাল থেকে সরলাকে দেখ্‌ছিনে কেন ?"

"সে কী কথা, জানো না সরকার বাহাদুর যে তাকে পুলিপোলাও চালান দিয়েছে ?"

"কেন কী করেছিল ?"

"দরোয়ানের সঙ্গে ষড় করে বড়ো লাটের মেম-সাহেবের ঘরে ঢুকেছিল।"

"কী করতে ?"

"মহারাণীর শিলমোহর থাকে যে বাক্সোয় সেইটে চুরি কর্‌তে, আচ্ছা বুকের পাটা।"

"লাভ কী ?"

"ঐ শোনো, সেটা পেলেই তো সব হোলো। লাট সাহেবের ফাঁসি দিতে পার্‌ত। সেই মোহরের ছাপেই তো রাজ্যি খানা চল্‌ছে।"

"আর ঠাকুরপো ?"

"সিঁধ কাঠি বেরিয়েছে তাঁর পাগড়ির ভিতর থেকে, দিয়েছে তাঁকে হরিণবাড়িতে, পাথর ভাঙাবে পঁচাশ বছর। আচ্ছা খোঁকি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি থেকে যাবার সময় সরলা দিদি তার জাফরাণি রঙের শাড়ীখানা আমাকে দিয়ে গেল। বল্‌লে, 'তোমার ছেলের বৌকে দিয়ো।' চোখে আমার জল এল। কম দুঃখ তো দিইনি ওকে। এই শাড়ীটা যদি রেখে দিই কোম্পানী বাহাদুর ধর্‌বে না তো ?"

"ভয় নেই তোর। কিন্তু শীগ্‌গির যা। বাইরের ঘরে খবরের কাগজ প'ড়ে আছে, নিয়ে আয়।"

পড়্‌ল কাগজ। আশ্চর্য্য হোলো, আদিত্য তাকে এত বড়ো খবরটাও দেয়নি। এ কি অশ্রদ্ধা ক'রে ? জেলে গিয়ে জিত্‌ল ঐ মেয়েটা। আমি কি পারতুম না যেতে যদি শরীর থাকৃত ? হাস্‌তে হাস্‌তে ফাঁসী যেতে পারতুম।

"রোশ্‌নি, তোদের সরলা দিদিমণির কাণ্ডটা দেখ্‌লি ? হাটের লোকের সামনে ভদ্রঘরের মেয়ে"—

আয়া বল্‌লে "মনে পড়্‌লে গায়ে কাঁটা দেয়, চোর ডাকাতের বাড়া। ছি ছি।"

"ওর সব তাতেই গায়ে-পড়া বাহাদুরী। বেহায়াগিরির একশেষ। বাগান থেকে আরম্ভ ক'রে জেলখানা পর্য্যন্ত। মর্‌তে মর্‌তেও দেমাক ঘোচে না।"

আয়া্র মনে পড়্‌ল জাফরাণি রঙের শাড়ীর কথা। বল্‌লে, "কিন্তু খোঁখি, দিদিমণির মনখানা দরাজ।" কথাটা নীরজাকে মস্ত ধাক্কা দিলে। সে যেন হঠাৎ জেগে উঠে বল্‌লে "ঠিক বলেছিস্‌ রোশ্‌নি। ঠিক বলেছিস্‌। ভুলে গিয়েছিলুম। শরীর খারাপ থাক্‌লেই মন খারাপ হয়। আগের থেকে যেন নীচু হয়ে গেছি। ছি ছি নিজেকে মার্‌তে ইচ্ছে করে। সরলা খাঁটি মেয়ে, মিথ্যে কথা জানে না। অমন মেয়ে দেখা যায় না। আমার চেয়ে অনেক ভালো। শীগ্‌গির আমাদের গণেশ সরকারকে ডেকে দে।" আয়া চলে গেলে « পেন্সিল নিয়ে একটা চিঠি লিখ্‌তে বস্‌ল। গণেশ এল। তাকে বল্‌লে, "চিঠি পৌঁছিয়ে দিতে পার্‌বে জেলখানায় সরলা দিদিকে?" গণেশ গাঙ্গুলীর কৃতিত্বের অভিমান ছিল। বল্‌লে, "পার্‌ব। কিছু খরচ লাগ্‌বে। কিন্তু কী লিখ্‌লে মা শুনি, কেননা পুলিসের হাত দিয়ে যাবে চিঠিখানা"। নীরজা পড়ে শোনালে, "ধন্য তোমার মহত্ত্ব। এবার জেলখানা থেকে বেরিয়ে যখন আস্‌বে,

তখন দেখ্‌বে তোমার পথের সঙ্গে আমার পথ মিলে গেছে।” গণেশ বল্‌লে “ঐ যে পথটার কথা লিখেছ ভালো শোনাচ্ছে না। আমাদের উকীলবাবুকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে।”

গণেশ চলে গেল। নীরজা মনে মনে রমেনকে প্রণাম করে বল্‌লে, “ঠাকুরপো, তুমি আমার গুরু।”

১০

আদিত্য একটা পেয়ালায় ওষুধ নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলে।

নীরজা বললে, "এ আবার কী?"

আদিত্য বললে "ডাক্তার বলে গেছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হবে।"

"ওষুধ খাওয়াবার জন্য বুঝি আর পাড়ায় লোক জুটল না। না হয় দিনের বেলাকার জন্যে একজন নার্স রেখে দাও না, যদি মনে এতই উদ্বেগ থাকে।"

"সেবার ছলে কাছে আসবার সুযোগ যদি পাই ছাড়ব কেন?"

"তার চেয়ে কোনো সুযোগে তোমার বাগানের কাজে যদি যাও তো ঢের বেশি খুসি হব। আমি পড়ে আছি, আর দিনে দিনে বাগান নষ্ট হয়ে যাচ্চে।"

"হোক্ না নষ্ট। সেরে ওঠো আগে, তারপর সেদিনকার মতো দুজনে মিলে কাজ করব।"

"সরলা চলে গেছে, তুমি একলা পড়েছ, কাজে মন যাচ্চে না। কিন্তু উপায় কী? তাই ব'লে লোকসান করতে দিয়ো না।"

"লোকসানের কথা আমি ভাব্‌ছিনে নীরু। বাগান করাটা যে আমার ব্যবসা সে কথা এতদিন তুমিই ভুলিয়ে রেখেছিলে, কাজে তাই সুখ ছিল। এখন মন যায় না।"

"অমন করে আক্ষেপ করছ কেন? বেশতো কাজ করছিলে এই সেদিন পর্য্যন্ত। কিছু দিনের জন্যে যদি বাধা পড়ে তাই নিয়ে এত ব্যাকুল হোয়ো না।"

"পাখাটা কি চালিয়ে দেবো?"

"বাড়াবাড়ি কোরো না তুমি, এ সব কাজ তোমাদের নয়। এতে আমাকে আরো ব্যস্ত ক'রে তোলে। যদি কোনো রকম ক'রে দিন কাটাতে চাও তো তোমাদের তো হর্টিকাল্‌চরিস্‌ট্‌ ক্লাব্‌ আছে।"

"তুমি যে রঙীন লিলি ভালোবাসো, বাগানে অনেক খুঁজে একটাও পাই নি। এবারে ভালো বৃষ্টি হয়নি বলে গাছগুলোর তেজ নেই।"

"কী তুমি মিছিমিছি বক্‌ছ। তার চেয়ে হলাকে ডেকে দাও, আমি শুয়ে শুয়েই বাগানের কাজ করব। তুমি কি বল্‌তে চাও আমি শয্যাগত বলেই আমার বাগানও হবে শয্যাগত? শোনো আমার কথা। শুক্‌নো সীজন্‌ ফুলের গাছগুলো উপ্‌ড়িয়ে ফেলে সেখানে জমি তৈরি করিয়ে নাও। আমার সিঁড়ির নীচের ঘরে শর্ষের খোলের বস্তা আছে। হলার কাছে আছে তার চাবী।"

"তাই নাকি, হলা তো এতদিন কিছুই বলেনি।"

"বল্‌তে ওর রুচ্‌বে কেন? ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করেছ? কাঁচা সাহেব এসে প্রবীণ কেরাণীকে যে রকম গ্রাহ্য করে না সেই রকম আর কী।"

"হলা মালী সম্বন্ধে সত্য কথা বল্‌তে যদি চাই তবে সেটা অপ্রিয় হয়ে উঠ্‌বে।"

"আচ্ছা, আমি এই বিছানায় পড়ে থেকেই ওকে দিয়ে কাজ করাব, দেখ্‌বে দুদিনেই বাগানের চেহারা ফেরে কি না। বাগানের ম্যাপ্‌টা আমার কাছে দিয়ো। আর আমার বাগানের ডায়রীটা। আমি ম্যাপে পেন্সিলের দাগ দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবো।"

"আমার তাতে কোনো হাত থাক্‌বে না?"

"না। যাবার আগে এ বাগানে সম্পূর্ণ আমার ছাপ মেরে দেবো। বলে রাখ্‌ছি রাস্তার ধারের ঐ বট্‌ল্‌ পাম্‌গুলো আমি একটাও রাখ্‌ব না। ওখানে ঝাউ গাছের সার লাগিয়ে দেবো। অমন করে মাথা নেড়ো না। হয়ে গেলে তখন দেখো। তোমাদের ঐ লন্‌টা আমি রাখ্‌ব না, ওখানে মার্ব্বলের একটা বেদী বাঁধিয়ে দেবো।"

"বেদীটা কি ও জায়গায় মানাবে? একটু যেন যাকে বলে শস্তা নবাবী।"

"চুপ করো। খুব মানাবে। তুমি কোনো কথা বল্‌তে পার্‌বে না। কিছুদিনের জন্যে এ বাগানটা হবে একলা আমার, সম্পূর্ণ আমার। তারপর সেই আমার বাগানটা আমি তোমাকে দিয়ে যাব। ভেবে-ছিলে আমার শক্তি গেছে। দেখিয়ে দেবো কী কর্‌তে পারি। আরো তিনজন মালী আমার চাই, আর মজুর লাগ্‌বে জন ছয়েক। মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে বাগান সাজিয়ে তোলার শিক্ষা আমার হয়নি। হয়েছে কি না তার পরীক্ষা দিয়ে যাব। তোমাকে মনে রাখ্‌তেই হবে যে এ আমার বাগান, আমারই বাগান, আমার স্বত্ব কিছুতে যাবে না।"

"আচ্ছা সেই ভালো, তাহোলে আমি কী করব ?"

"তুমি তোমার দোকান নিয়ে থাকো ; সেখানে তোমার আপিসের কাজ তো কম নয়।"

"তোমাকে নিয়ে থাকাও তাহোলে নিষিদ্ধ ?"

"হাঁ, সর্ব্বদা কাছে থাক্‌বার মতো সে আমি আর নেই—এখন আমি কেবল আর একজনকে মনে করিয়েই দিতে পারি—তাতে লাভ কী ?"

"আচ্ছা বেশ। যখন তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে তখনি আস্‌ব। ডেকে পাঠিয়ো আমাকে। আজ সাজিতে তোমার জন্য গন্ধরাজ এনেছি, রেখে যাই তোমার বিছানায়, কিছু মনে কোরোনা।" ব'লে আদিত্য উঠে পড়্‌ল।

নীরজা হাত ধরে বল্‌লে "না যেয়ো না, একটু বোসো।" ফুলদানীতে একটা ফুল দেখিয়ে বল্‌লে, "জানো এ ফুলের নাম ?"

আদিত্য জানে কী জবাব দিলে ও খুসি হবে, তাই মিথ্যে করে বল্‌লে, "না জানিনে।"

"আমি জানি। বলব, পেটুনিয়া। তুমি মনে করো আমি কিছু জানিনে, মূর্খ আমি।"

আদিত্য হেসে বল্‌লে, "সহধর্ম্মিণী তুমি, যদি মূর্খ

হও অন্তত আমার সমান মূর্খ। আমাদের জীবনে মূর্খতার কারবার আধাআধি ভাগে চল্‌ছে।”

“সে কারবার আমার ভাগ্যে এইবারে শেষ হয়ে এল। ঐ যে দারোয়ানটা ঐখানে ব'সে তামাক কুট্‌ছে, ও থাক্‌বে দেউড়িতে, কিছুদিন পরে আমি থাক্‌ব না। ঐ যে গোরুর গাড়ীটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্চে ওর যাতায়াত চল্‌বে রোজ রোজ, কিন্তু চল্‌বে না আমার এই হৃদয়-যন্ত্রটা।” আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধর্‌লে, বল্‌লে, “একেবারেই থাক্‌ব না, কিচ্ছুই থাক্‌ব না? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো না আমাকে সত্যি ক'রে।”

“যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর। যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি আর এগোয়নি।”

“বলো না তুমি কী মনে করো! একটুও থাক্‌ব না? এতটুকুও না?”

“এখন আছি এটাই যদি সম্ভব হয়, তখন থাক্‌ব সেও সম্ভব!”

“নিশ্চয়ই সম্ভব, ঐ বাগানটা সম্ভব, আর আমিই

হব অসম্ভব, এ হোতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধ্যেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো, আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্চে আমার আঙুলের ছোঁওয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে ?"

আদিত্যকে বলতে হোলো "হাঁ মনে করব।" কিন্তু এমন সুরে বলতে পারলে না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

নীরজা অস্থির হয়ে বলে উঠল, "তোমাদের বই যারা লেখে ভারী তো পণ্ডিত তারা, কিচ্ছু জানে না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি। এই তোমাকে বলে যাচ্চি, কথা দিয়ে যাচ্চি তোমার বাগানের গাছ-পালা সমস্তই আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না। কাউকে না।"

বিছানায় শুয়েছিল নীরজা ; উঠে বালিশে ঠেসান দিয়ে বস্‌ল, বল্‌লে "আমাকে দয়া কোরো দয়া কোরো। তোমাকে এত ভালোবাসি সেই কথা মনে ক'রে আমাকে দয়া কোরো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনি করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে সব ফুল ফুট্‌বে তেমনি করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তা হোলে তো এখানে আমি থাক্‌তে পার্‌ব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তাহোলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন্ শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব ?" নীরজার দুই চক্ষু দিয়ে জল ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

আদিত্য মোড়া ছেড়ে বিছানার উপর উঠে বস্‌ল। নীরজার মুখ বুকে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগ্‌ল তার মাথায়। বল্‌লে "নীরু শরীর নষ্ট কোরো না।"

"যাক্ গে আমার শরীর। আমি আর কিচ্ছু চাই নে আমি কেবল তোমাকে চাই এই সমস্ত কিছু নিয়ে। শোনো একটা কথা বলি, রাগ কোরো না আমার উপর রাগ কোরোনা," বল্‌তে বল্‌তে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

একটু শান্ত হোলে পর বল্‌লে "সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বল্‌ছি আর অন্যায় কর্‌বনা। যা হয়েছে তার জন্যে আমাকে মাপ করো। কিন্তু আমাকে ভালোবাসো, ভালোবাসো তুমি, যা চাও আমি সব কর্‌ব।"

আদিত্য বল্‌লে, "শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন ছিল অসুস্থ, নীরু তাই নিজেকে মিথ্যা পীড়ন করেছ।"

"শোনো বলি। কাল রাত্রি থেকে বারবার পণ করেছি, এবার দেখা হোলে নির্ম্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তা হোলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পার্‌ব।"

এ কথার কোনো উত্তর না করে আদিত্য বারবার চুম্বন কর্‌লে ওর মুখ, ওর কপাল। মুদে এল নীরজার চোখ। খানিক বাদে নীরজা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "সরলা কবে খালাস পাবে সেইদিন গুণছি। ভয় হয় পাছে তার আগে মরে যাই। পাছে ব'লে যেতে না পারি যে আমার মন একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এইবার আলো জ্বালাও। আমাকে পড়ে শোনাও অক্ষয়

বড়ালের 'এষা'।" বালিশের নীচ থেকে বই বের করে দিলে। আদিত্য পড়ে শোনাতে লাগ্‌ল।

শুন্‌তে শুন্‌তে যেই একটু ঘুম এসেছে আয়া ঘরে এসে বল্‌ল, "চিঠি", ঘোর ভেঙে নীরজা চম্‌কে উঠ্‌ল। ধড় ধড় কর্‌তে লাগ্‌ল তার বুক। কোনো বন্ধু আদিত্যকে খবর দিয়েছে, জেলে স্থানাভাব, তাই যে-কয়টি কয়েদীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই ছেড়ে দেওয়া হবে সরলা তার মধ্যে একজন। আদিত্যের মনটা লাফিয়ে উঠ্‌ল। প্রাণপণ বলে চেপে রাখ্‌লে মনের উল্লাস। নীরজা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কার চিঠি, কী খবর?"

পাছে পড়্‌তে গেলে গলার আওয়াজ যায় কেঁপে, চিঠিখানা দিলে নীরজার হাতেই। নীরজা আদিত্যের মুখের দিকে চাইলে। মুখে কথা নেই বটে কিন্তু কথার প্রয়োজন ছিল না। নীরজার মুখেও কথা বেরোলো না কিছুক্ষণ। তারপরে খুব জোর করে বল্‌লে, "তাহোলে তো আর দেরি নেই। আজই আস্‌বে। ওকে আন্‌বে আমার কাছে।"

"ও কী! কী হোলো নীরু! নার্স! ডাক্তার আছেন?"

"আছেন বাইরের ঘরে।"

"এখনি নিয়ে এসো, এই যে ডাক্তার। এইমাত্র বেশ সহজ শরীরে কথা বল্‌ছিল ; বল্‌তে বল্‌তে অজ্ঞান হয়ে গেল।"

ডাক্তার নাড়ী দেখে চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে রোগী চোখ মেলেই বল্‌লে "ডাক্তার আমাকে বাঁচাতেই হবে। সরলাকে না দেখে যেতে পার্‌ব না, ভালো হবে না তাতে। আশীর্ব্বাদ কর্‌ব তাকে। শেষ আশীর্ব্বাদ।"

আবার এল চোখ বুজে। হাতের মুঠো শক্ত হোলো, বলে উঠ্‌ল, "ঠাকুরপো কথা রাখ্‌ব, কৃপণের মতো মর্‌ব না।"

এক একবার চেতনা ক্ষীণ হয়ে জগৎ ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে আবার নিবু-নিবু প্রদীপের মতো জীবন-শিখা উঠ্‌ছে জ্বলে। স্বামীকে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছে, "কখন আস্‌বে সরলা ?"

থেকে থেকে সে ডেকে ওঠে, "রোশ্‌নি।"

আয়া বলে "কী খোঁখি !"

"ঠাকুরপোকে ডেকে দে এক্ষুণি।" একবার আপনি বলে ওঠে "কী হবে আমার ঠাকুরপো। দেবো দেবো দেবো, সব দেবো।"

রাত্রি তখন ন-টা। নীরজার ঘরের কোণে ক্ষীণ আলোতে জ্বল্‌ছে একটা মোমের বাতি। বাতাসে দোলনচাঁপার গন্ধ। খোলা জানলার থেকে দেখা যায় বাগানের গাছগুলোর পুঞ্জীভূত কালিমা, আর তার উপরের আকাশে কালপুরুষের নক্ষত্রশ্রেণী। রোগী ঘুমোচ্চে আশঙ্কা ক'রে সরলাকে দরজার কাছে রেখে আদিত্য ধীরে ধীরে এল নীরজার বিছানার কাছে।

আদিত্য দেখ্‌লে ঠোঁট নড়্‌ছে। যেন নিঃশব্দে কী জপ কর্‌ছে। জ্ঞানে অজ্ঞানে জড়িত বিহ্বল মুখ। কানের কাছে মাথা নামিয়ে আদিত্য বল্‌লে "সরলা এসেছে।" চোখ ঈষৎ মেলে নীরজা বল্‌লে, "তুমি যাও"—একবার ডেকে উঠ্‌ল, "ঠাকুরপো।"—কোথাও সাড়া নেই।

সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। পা দ্রুত আপনি গেল স'রে। ভাঙা গলায় বলে উঠ্‌ল "পারলুম না, পারলুম না, দিতে পার্‌ব না, পার্‌ব না।" বল্‌তে বল্‌তে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে—চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। চেপে ধর্‌লে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হোলো,

বল্‌লে, "জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাক্‌ব, থাক্‌ব, থাক্‌ব।"

হঠাৎ ঢিলে সেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্ত্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। অদ্ভুত গলায় বল্‌লে "পালা পালা পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধ্‌ব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেল্‌ব তোর রক্ত।" বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

গলার শব্দ শুনে আদিত্য ছুটে এল ঘরে, প্রাণের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে ফেলে দিয়ে নীরজার শেষ কথা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।